হোঁদল কুৎকুৎ

ডিরেক্টর বাহাদুর কর্ত্তৃক বঙ্গদেশের যাবতীয় স্কুলের জন্য
প্রাইজ ও লাইব্রেরী পুস্তকরূপে অনুমোদিত
[কলিকাতা গেজেট, ২৩শে মে, ১৯৪০]

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু, বি. এস্-সি.

প্রকাশক
বৃন্দাবন ধর অ্যাণ্ড্ সন্স্ প্রাইভেট লিমিটেড্
স্বত্বাধিকারী—আশুতোষ লাইব্রেরী
৫, বঙ্কিম চাটুয্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

অষ্টম সংস্করণ
১৩৭১

মুদ্রাকর
শ্রীরামকৃষ্ণ পাল
শ্রীনরসিংহ প্রেস
৫, বঙ্কিম চাটুয্যে ষ্ট্রীট
কলিকাতা


উপহার

উৎসর্গ

'কচুগাছ কেটে কেটে বীর, রুগী মেরে মেরে ডাক্তার, বই ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়ুয়া',— হোঁদল কুৎকুতের এই আপ্তবাক্য আজও কুপোকাৎ হয় নি!...

কিন্তু সেদিন এ বই যাদের উৎসর্গ করা হয়েছিল তারা বই-ছেঁড়া-পড়ুয়ার ভোল পালটেছে।

তাই তাদের পরবর্ত্তী যারা পড়তে শেখেনি বলে রঙ্গিন বই দেখলে সম্ভবতঃ ছেঁড়ার জন্য কাড়াকাড়ি করে থাকে, অর্থাৎ লালী, মিতু, বাবুয়া, গীতু, মিঠু ও বাচ্চুকে দিলাম।

১৫৯, রায়বাহাদুর রোড, বেহালা, কলিকাতা-৩৪ } লেখক

ভূমিকা

আমাদের বাংলা দেশের যে সব লেখক শিশুসাহিত্য রচনার দ্বারা জাতিকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন এবং করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসুর নাম শিশু-জগতে সুপরিচিত ; শুধু শিশু ও কিশোরেরা কেন তাহাদের কল্যাণপ্রার্থী মাতাপিতা, অভিভাবক ও শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের কাছেও পরম আদরণীয়। এক সময়ে তাঁহার লেখা ঘরে ঘরে গৃহপঞ্জিকার মত আদৃত হইয়াছিল। বালক ও কিশোরদের মুখে মুখে শোনা যাইত 'হাঁদল কুৎকুৎ' গ্রন্থের অপূর্ব্ব গল্প। এমন হাস্যকৌতুকপূর্ণ মনোমদ গল্প শিশুসাহিত্যে অতি অল্পই আছে। শিশিরসিক্ত হেমন্ত শেফালীর মত সুন্দর আনন্দপূর্ণ সাবলীল ভাষায় বইখানি লেখা। একজন বিখ্যাত ইংরাজ লেখকের ভাষায় বলা যায়, 'His style is clear and lively, his tales are seasoned with humour and include scenes of pure comedy based on real incidents, and actual characters—for he came to know many types of men and was a shrewd observer of human nature.'

'হোঁদল কুৎকুৎ' গল্পটি শিক্ষা ও আনন্দের অপূর্ব্ব নিদর্শন। গ্রন্থখানির অষ্টম সংস্করণ ইহা বালকবালিকাদের কাছে কত প্রিয় তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

এ বইখানা এখনও সর্ব্বত্র সমাদৃত—তেমনি তাঁহার লেখা হাসির গল্পের বই—'তালপাতার সেপাই', 'হুসন্ত মহারাজ',

'মাণিকজোড়' প্রভৃতিও শিশুরঞ্জন সাহিত্যের এক নূতন পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে।—এই তিনখানি বই অনিবার্য্য কারণে মুদ্রিত হইতে পারিতেছে না। বই ক'খানি প্রকাশিত হইবার পরই তিনটি সংস্করণ ছাপা হইয়াছিল।

আমরা আশা করি 'গ্রন্থকার শীঘ্রই এই বই তিনখানা পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করিবেন। এগুলি প্রকাশিত না হওয়ায় শিশুসাহিত্যের যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হইয়াছে।

সাহিত্যপ্রাণ নিষ্ঠাবান সাহিত্যরথী প্রফুল্লবাবু প্রবীণ বয়সে যেরূপ দৈহিক, মানসিক এবং আর্থিক বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়াও অক্লান্তভাবে পরম সহিষ্ণুতার সহিত শিশুসাহিত্যের সেবা করিতেছেন সেজন্য আন্তরিক প্রীতি ও ভালবাসার সহিত তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতেছি। বিধাতার শুভ আশীর্ব্বাদে তিনি শতজীবী হইয়া বাংলার শিশুসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করুন ইহাও প্রার্থনা করি। প্রফুল্লবাবুর সাহিত্যচর্চ্চা সর্ব্বতোভাবে জয়যুক্ত হউক।

(স্বা) শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
'শিশুভারতী' সম্পাদক

অষ্টম সংস্করণের নিবেদন

'হোঁদল কুৎকুৎ'এর অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। বইটি আসলে হোঁদলের জীবনচিত্র। তার বিলম্বিত প্রকাশে পাঠকের মনঃক্ষুণ্ণ হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু হোঁদল বলে, বিলম্বিত লয়ের ফাঁকে গানের নানান্ কারুকার্য্যের মত, এ অবসরে বইটি নতুন রঙে ছোপান মান বাড়ানোর পক্ষে কম নয়।

সুতরাং তাই করা হ'ল।

যে সব কচিকাঁচারা সবুজমনের অবুঝ ঢঙ নিয়ে বাঁচে, তারা 'রামধনুর' রঙ-বাহার দেখে ঝুমুর-ঝুমুর নাচে। রঙের সমালোচনা তাদের কাছে কিছু নয়। আর হোম্‌রা-চোম্‌রা গুম্‌রোমুখো যে সব রঙকানার হাসতে মানা, তাদের জন্য হোঁদলের একটি দাওয়াই জানা আছে। তা তার ছবিঘরে কাতুকুতু-মাখানো 'হার্ডেল কিট'এর কাছে টেনে আনা।

অতএব—সাধু সাবধান!…

—লেখক—

লেখকের অন্যান্য বই

(ছোটদের)

তালপাতার সেপাই (৩য় সংস্করণ)

মাণিকজোড় (৩য় সংস্করণ)

হসন্ত-মহারাজ (৩য় সংস্করণ)

নিঝুম-নিঝুম (যন্ত্রস্থ)

(বড়দের)

দিগ্বিদিক

রবি-দাদা (৩য় সংস্করণ)

মিলন-রাত্রি (২য় সংস্করণ)

মায়া-উদ্যান (২য় সংস্করণ)

সুরের হাওয়া (২য় সংস্করণ)

হাল্কা হাসির গল্প
মিলন-যমুনা-তীরে } (যন্ত্রস্থ)

লেখক-পরিচিত

বহু বইএর লেখক শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু ছেলেবেলা থেকে শিল্প ও সাহিত্যধর্ম্মী। চারুশিল্পকলা, যন্ত্রসঙ্গীত, কাব্য ও কথাসাহিত্যে সহজাত অনুরাগ তাঁর সাহিত্যস্পৃষ্টিকে প্রভাবিত করেছে।

ঢাকা জগন্নাথ কলেজে আই. এস্-সি, কলিকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজে বি. এস্-সি, অল্পকাল কলিকাতা মেডিকেল কলেজে এম্. বি, এবং তারপর ঢাকা কলেজে এম্. এস্-সি. পাঠকালে ভারত মহিলা, প্রতিভা, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, যমুনা, মালঞ্চ, মর্ম্মবাণী, বসুমতী প্রভৃতি বহু পত্রিকায় লেখা তাঁর গল্প, এবং গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, অন্নদা বুক ষ্টল ও আশুতোষ লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত তাঁর উপন্যাস ও গল্পের বইগুলি আদৃত হয়েছিল।

শিশুসাহিত্যে প্রকাশিত তাঁর হাসির বইগুলি প্রচুর সমাদর পেয়েছে।

ঢাকা গেণ্ডারিয়া আশ্রমের পবিত্র পরিবেশে, বিশিষ্ট মহাপুরুষের স্নেহচ্ছায়াপুষ্ট জীবন-বেদ তাঁর লেখায় ব্যক্তি ও জাতিগঠনের যে উপাদান যুগিয়েছে, তার মূল্যমান সামান্য নয়।

পরিণত বয়সে নানা বিপর্য্যয়ের মধ্যেও নির্জ্জন সাহিত্য-সেবায় তিনি একনিষ্ঠ।

হোঁদল কুৎকুৎ

এক

গঙ্গারামের পুত্র ভ্যাবলরাম,—তস্য পুত্র হোঁদলরাম। তিন পুরুষের নামে পরিচয়,—তা নেহাৎ কম নয়!…

যেদিন জন্ম,—ঝড়-বাদলে পৃথিবী ভেসে যায়। বৃষ্টির ঝাঁক, দেয়ার ডাক, ঝড়ের হাঁক,—মাথা বাঁচাবার ফাঁক নেই। তাক লাগার কথা!

কিন্তু কেষ্টঠাকুরের জন্ম অম্নি দিনে, তাই ঠাকুরমা আহ্লাদে টইটম্বুর। জাঁক করে বল্লেন, "ছেলেটা কেউ-কেটা না হয়ে যায় না। হয়ত কেষ্ট-বিষ্টু পথ ভুলে এসেছে গা!"

পথভোলা কেউ-কেটার নতুন সৃষ্টি বটে। রূপের গাঙে রূপ ভেসে যায়, গুণের গাঙে গুণ ভেসে যায়!

জমাটকরা আলকাতরার পুতুল! বিশ্বকর্ম্মার অসতর্ক হাতুড়ির ঘায়ে নাকের ডগাটা হঠাৎ গেছে ভেঙ্গেচুরে,—চোখের মণি গেছে নড়ে। দেড়খানা চোখের অপরূপ দৃষ্টি। পুবে চাইলে মনে হয় চেয়ে আছে পশ্চিমে,—পশ্চিমে চাইলে মনে হয়

চেয়ে আছে পুবে! দিকের বালাই নাই,—যেদিকে চায় যেন ফিক্‌ফিক্ করে হেসে চোখ মটকায়।...

যখন কাঁদে যেন ঘ্যাঙর্-ঘ্যাঙর্ নানা ছাঁদে কোলাব্যাঙ ডাকে। হাসি না ঢাকের আওয়াজ,—পুজো-বাটিতে জোড় কাঠিতে বাজে!...

ছেলে হবার কথা নয়। ঠাকুর-দেবতার পায়ে অনেক কপাল কোটাকুটি, তারকেশ্বর-মন্দিরে লুটোপুটি, বামুন-পণ্ডিতের কাছে হুঁটোপুটি,—তাছাড়া তন্তর-মন্তর, তুক্-তাক, কবচ-মাছুলী, —তারপর এই শিবরাত্রির সল্‌তেটুকু!

আনন্দ দেখে কে? অনেক ঝাঁক শাঁখ আর উলুধ্বনি,—ঘটা করে কাঁসর-ঘণ্টা বাজানো,—পুরুতের মন্ত্রপাঠ, হোমযাগ,—হিজ্‌রার ঢোল পেটানো, এবং আত্মীয়স্বজন, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের ভূরি-ভোজন হ'ল। তারপর ছেলের হাতে, গলায়, কোমরে এন্তার কবচ-মাছুলী বেঁধেও সোয়াস্তি নেই।

অমন সোনার চাঁদ ছেলেকে লুফে নেবার জন্য যমের চেলারা কোন্ দিকে ফাঁদ পেতে বসে আছে কে জানে? একটু ফাঁক পেলে ক্যাক্ করে ধরবে।

তাই মাত্রাহারা সতর্ক দৃষ্টির ভিতর হোদল বড় হতে লাগল!...

ঠাকুরমা তেত্রিশ কোটি দেবতার কাছে হোঁদলের পরমায়ুর আর্জ্জি পেশ করলেন। যে দেবতা যাতে তুষ্ট তেমনতর দরখাস্ত! কাউকে চালকলা, বাতাসা ও সন্দেশের নৈবেদ্য, কাউকে নীলপদ্ম, রক্তজবা, আস্ত পাঁঠা—অর্থাৎ কাউকে পদ্যে, আর কাউকে গদ্যে স্তবস্তুতি!...

তারপর যখন দেখলেন তাঁরা সন্তুষ্ট হয়েছেন, তখন জাঁক করে বললেন, "যে-সে ছেলে হোঁদল নয়। সবার থাকে পাঁচ আঙ্গুল, আর ওর হাতে পায়ে হ'ল গিয়ে ছয়টি করে দেড় কুড়ি আঙ্গুল। অর্থাৎ বুঝলে কি না, একটা বেলেস্তার-মেজেস্তার ও হবেই!"

যে সব মেয়েরা ছুটো খোসামুদে কথা বলে তিনটে মিষ্টি আর প্যাড়া খেতে আসত, তারা সায় দিয়ে পেয়ারে সেজে বলত, "তা আমরা জানি নে মাসীমা? তা ত ধর, ও হয়েই আছে।"

এমন ইষ্টি কথা কয়ে, তিনটি মিষ্টি খেয়ে ছুটো ফাউ তারা বয়ে নিত।··

মাই খেতে খেতে ক্ষুদে হোঁদল টেরা চোখে মায়ের দিকে



চাইত। আর মনে হ'ত সে চেয়ে আছে ঠাকুরমার পানে। ঠাকুরমা গদ্‌গদস্বরে বলতেন, "দেখলে গা বৌমা, এখুনি ছেলেটা

আমায় কেমন চিনে ফেলেছে! ওর বাপ আমার মাই খেয়ে বড় হয়েছে কিনা, তাই সে-কথা ঠাওরাতে ওর বাকি নেই!”

ঐটুকুন ছেলের অমন গুণপনার বাখান শুনে মায়ের মন আনন্দে আনচান করে।…

একটু বড় হতেই হোঁদলের চেহারার জৌলস খুলে গেল। ঠাকুরমার দেদার আদরে এন্তার অপথ্য-কুপথ্য খেয়ে, তার শরীরখানি হয়ে উঠল হাড়-গিরগিরে। লিক্‌লিকে ঘাড়ের উপর প্রকাণ্ড মাথাটি বয়ে, যখন লক্‌বক করে সে ছুটোছুটি করত, তখন মনে হ'ত, বর্ণমালার বইয়ের পাতা ছেড়ে এসে একটা জ্যান্ত প্রশ্নচিহ্ন নেচে বেড়াচ্ছে!…

বাপের আলকাতরার মস্ত বড় কারবার। সেই দৌলতে ঘরবাড়ী আর বড়মানুষীর বাহার। তাই ঐ রংটার উপর তাঁর টান ছিল জোরদার। তিনি বলতেন, “কালো—জগতের আলো।”

হোঁদলের কালো চেহারা তাঁর ভালো লাগত। বোধ করি তিনি মনে মনে ভাবতেন,—বড় হয়ে আলকাতরার গুদামে বসে হোঁদল যখন গরমে ঘামাবে, তখন নিখরচায় গুদামের মাল গল্‌গল্‌ করে উথলে উঠবে—একমণ আলকাতরা হবে দু'মণ!

ছেলেটাকে একবার মোটা করে তুলতে পারলে হয়। তাই হিসাব করে, তিনি বড় বড় ডাক্তার দেখালেন। তাঁরা হোঁদলকে উল্টেপাল্টে, কাৎ করে, চিৎ করে, জিভ টেনে, পেট টিপে, বুকে পিঠে টেথেস্কোপ বসিয়ে পরীক্ষা করলেন। তারপর সব মোক্ষম ওষুধ বাত্‌লে গেলেন। সঙ্গে বাটিভরা

দুধ ও কড্‌লিভার তেল। ফলে হোঁদল ফোলা শুরু করল, এবং দেখ্‌ দেখ্‌ করে বুনো শূয়োরের মত নাদুস-নুদুস হয়ে উঠল। ঠাকুরমা খুসীতে ডগমগ হয়ে, ঠাকুর-ঘরে এমন মাথা কুটলেন যে কপাল ফুলে উঠে গম্বুজ হ'ল। তা সারাতে তিনদিন পটি বাঁধাছাদা!

দুই

বড় হয়ে হোঁদলের মগজে যত বুদ্ধি গজাল ঠাকুরমার মনে ততই জোরাল আনন্দ হ'ল।

আধ-আধ কথা শিখে হোঁদল মাকে ডাকা শুরু করল 'হাম্বা', ঠাকুরমাকে 'কুকুম্মা', বাপকে 'আব্বা'।

এই অদ্ভুত ডাকের ভিতর বুদ্ধির ছিঁটেফোঁটা কি আছে তা অপরের বোঝা কঠিন। কিন্তু ঠাকুরমা তা অনায়াসে আবিষ্কার করে বললেন, "দেখলে গা, ছেলের বুদ্ধি! মা গো-দেবতার মত দুধ দিয়ে বাঁচায় বলে, হোঁদল মাকে ডাকে 'হাম্বা'। পাছে কুকুরে আমার ঠাকুরের ভোগ নষ্ট করে দেয়, তাই বুদ্ধিমান ছেলে মনে করিয়ে দেয়, 'কুকুর, মা'। আর বাপ বাইরে বাইরে থাকে বলে ডাকে—'আয় বাবা'।

পাড়ার খোসামুদে মেয়েরা গালে হাত দিয়ে বলে, "আচ্চয্যি! এমন ছেলে দেখি নি।"

ঠাকুরমা জাঁক করে বলেন, "আচ্চয্যি বলে আচ্চয্যি! পুরুত-আচায্যের ঘরে শুনেছ কখনো এ ধারার ডাক?"

তারা খোঁপা নেড়ে জানায়, শোনে নি।

হোঁদল কুৎকুৎ

ঠাকুরমা গদ্‌গদ স্বরে বলেন, "এখন পাঁচজন মিলে আশীর্ব্বাদ কর্, ওর পরমাই তোমাদের মাথার চুলের মত হোক।"

বিনিখরচায় আশীর্ব্বাদ করে লাভ আছে। তারা তা করে,—বিশেষ করে টেকোমাথা এলোকেশী। একদিন তার এলো কেশ ছিল, আজ চুল উঠে টাক। সেই ফাঁকা দোহাই পেড়ে পরমাইর আশীর্ব্বাদ করায় হোঁদলের লোকসান কেউ পরখ করে না।...

ঠাকুরমা তাদের আঁচল ভরে কাউকে তেঁতুল, কাউকে টোপাকুল, চাল্‌তে, কলা-মুলো দেন। বোধ করি তাদের আশীর্ব্বাদে,—অথবা অমন ছেলেতে যমের বিস্বাদ বলে, কোনও প্রমাদ ঘটল না। দেবতার প্রসাদে হোঁদলের পরমায়ু বেড়ে চলল। তার সঙ্গে বাড়্‌ল আব্‌দার।

বড়লোকের আদুরে দুলাল। তাই খেজমত করার জন্য ছিল ঝি-চাকর একপাল। ভজন, ভোজন, ক্রান্তি, ক্ষান্তি নানা রকম তাদের নাম। বোঁচা, খ্যাঁদা নানান্ চেহারা,—তামাটে ও কালো রংএর চাম। তাদের হরেক রকমের কাজকম্ম; কিন্তু হোঁদলের ফরমাস মেটাতে শরীরে ঘাম বেরোয়।

দু'মণ ওজনের দেহ নিয়ে, তাদের কোলে, পিঠে, কাঁধে দোল খেয়ে, সে তাদের কাঁদিয়ে ছাড়ে। আর আব্‌দার মেটাতে প্রাণরাখা প্রাণান্ত হয়।

কিন্তু হোঁদলের ঝি-চাকর হলেও তারা ত আর হোঁদল নয়। ক্রমে মগজ খাটিয়ে, তারা তাকে ঠকাবার ফিকির বার করে।

হোঁদল বায়না ধরে, "ঘোড়ায় চড়্‌ব, ভোজন। হেট্ হেট্।"

কি আর করা,—ভোজন চার হাত-পায়ে ঘোড়া হয়। বাচ্চা হাতীর ওজন নিয়ে হোঁদল পিঠে চড়ে বসে। রোগা পট্‌কা ভোজনের পিঠ বেঁকে যায়। ক'পাক ঘুরে সে হাঁপিয়ে ওঠে।

কিন্তু হোঁদল তার চিম্‌সে পেটে গোদা পায়ের লাথি মেরে বলে, "হেঁইও ঘোড়া, হেট্‌ হেট্‌।"



ভোজনের কাঁদা বাকি থাকে। অবশেষে সে বুদ্ধির ফাঁদ পেতে বলে, "আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। নড়তে চড়তে পারছি নে।"

ঘুমিয়ে কি করে কথা কয়, হোঁদলের মাথায় আসে না। সে বলে, "ঘুমিয়ে কথা বল,—ও ঘুম ঘুম নয়।"

ভোজন জানায়, ঘোড়াদের ঘুমের ধারা অমনি। আরজন্মে সে ঘোড়া ছিল, সব জানে। সে চিঁহি চিঁহি শব্দ করে।

আস্তাবলে ঘোড়া আছে। হোঁদল ডাক শুনেছে,—ওরা চিঁহি করে ডাকে। সে বিশ্বাস করে নেমে পড়ে,—আর ভোজন আড়মোড়া ভেঙ্গে ঘোড়া থেকে মানুষ হয়!…

আবার হঠাৎ মাঝরাতে হোঁদল আব্দার করে, "রোদে বসে পিঠে খাব,—বোঁদে খাব।"

পেটে খেলে পিঠে সয়, কিন্তু যখন-তখন পিঠে খেলে পেটে সয় না,—এ কথা কয়ে তাকে মানান যায় না। তখন তাকে ক্ষান্ত করাবার জন্য ক্ষান্তি ঝি অনেকগুলো বাতি জ্বেলে, আগুনের আল্‌সে খাটের তলায় লুকিয়ে, তার কাছে রাতকে দিন করে। তারপর দুধ, চিড়ে, রুটি, গুড় দিয়ে চট্‌কে, পিঠে বলে খেতে দেয়।

চোখ বুজে পিঠে খেতে ভারি মজা, এ কথা বোঝাতে সে সোজাসুজি তাই করে। দিন ও রাতের তফাৎ খোঁজে না। রোদে বসে চাকুম-চুকুম করে পিঠে খায়!...

আবার একদিন দোয়াত উপুড় করে সে জামায় কালি লাগায়। তারপর হুলুস্থূল বাঁধায়, তক্ষুণি দাগ তুলে দেওয়া চাই। কিন্তু সাবান দিয়ে ধুয়ে দাগ ওঠে না। তখন ভজন বোঝায়, "ও কালি কালি নয়, গায়ের ঘাম। এ ঘাম শুকিয়ে কালোজামের রং হয়।" জিভের তুষ্টি মিষ্টি জিনিসে হোঁদলের ইষ্টিজ্ঞান। সে মেনে নেয়।

ঠাকুরমা তারিফ করে বলেন, "কি বুদ্ধিমন্ত ছেলে গা! যুক্তির তন্তর-মন্তর দিয়ে বোঝাও, রা'টি নেই। বাপের বয়সে কেউ এমন দেখেছ?"

দেখেছে বলে কারু মনে পড়ে না।...

এ ভাবে হেলেদুলে হোঁদলের বয়স এগিয়ে চলে। ব্যবসায়ী ঘরের ছেলে। কিছু লেখাপড়া ও হিসাব-নিকাশে হাতে-খড়ি না হলে পাল তুলে চলা সম্ভব নয়। তাই বাপ খুঁজে পেতে

মাষ্টার নিয়ে এলেন। তাঁর চালচলন চৌখোস, ছিম্ছাম্, পরিপাটি বেশ। দাড়ি নেই, আছে গোঁফ। তা 'ডোণ্ট কেয়ার' (বেপরোয়া) পেটার্ণে ওপরপানে পাকানো—যেন কাঁকড়াবিছের মত এক জোড়া হুল!

ছানিপড়া চোখেও ঠাকুরমার দেখতে ভুল হ'ল না। তিনি জুলজুল চোখে চেয়ে, সাবধান করে বলেন, "ওর ননীর শরীল। হুল ফোটান চলবে না। মধু বুলিয়ে পড়াতে হবে।"

মাষ্টার মাথা নাড়েন। মধু না হোক, ঠাকুরমার দেওয়া সন্দেশ খেয়ে মিষ্টি গলায় পড়ান। কিন্তু অল্পদিনে বোঝেন ওর মগজে বিলকুল গোবর, আর তাতে রাজ্যের গুব্‌রে পোকা কিল্‌বিল্ করে। ক খ গ ঘ ঙ—এই পাঁচটি অক্ষর শিখতে হোঁদলের লাগে পূরো একমাস। তারপরও দিন পনের ক'কে গ ও গ'কে ঙ বলে মাষ্টারকে সে ঢঙ দেখায়। অবশ্য মাষ্টারটি ঝুনো। তিনি বুনো ওল আর বাঘা তেঁতুল দুইই জানেন। অনেক ঘাটের জল খেয়েছেন। একসময় যাত্রার দলে বেহালা বাজাতেন ও ভাঁড় সাজতেন। দল ভাঙ্গতে গলা ছেড়ে বর্ণমালা, ছড়ার বই ও ওষুধ ফিরি করেন। তার সঙ্গে পড়ুয়া পড়ানোর নামে ছেলে ঠেঙ্গান। বেহালার ছড় দিয়ে যাত্রার ছোক্‌রা পিটিয়ে গাধাকে ঘোড়া, আর ঘোড়াকে হাতী করেছেন। তাই তাঁর ধারণা, ভিখারি আর লাট সাহেবের নাতিকে সমানভাবে তৈরী করা তাঁর পক্ষে রীতিমত সহজ।

তিনি হোঁদলকে শেখান, "কচুগাছ কেটে কেটে হয় বীর—রুগী মেরে মেরে ডাক্তার—আর বই ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়ুয়া।"

হোঁদলের কাছে তা হয় আপ্তবাক্য। সে নিত্য বই ছিঁড়ে,

আর মাষ্টার তা যোগান। তার বই ফিরির ব্যবসায়, তাতে মুনাফা হয়। কিন্তু হোঁদল এক পা এগোয় না। মাষ্টার প্রাণপাত করে তাকে ছ'মাসে স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ শেখাতে পারেন না। সে জলস্রোতের মত ছল্‌ছল্‌ কল্‌কল্‌ করে যা খুসী উত্তর দেয়,—কোথাও বাধে না।

তারপর কুৎকুতে চোখে গৌরব মেখে জিজ্ঞেস করে, "হয়েছে মাষ্টার মশাই?"

এমন প্রশ্নের জবাব নেই। হোঁদলই তা জবাই করেছে। কাজেই যাত্রাগানের রাজার মত অ্যাক্টিং করে মাষ্টার একদিন বলেন,



"কি বা বলি? শোন বৎস, গাধার লড়াই,
গুরুরে না ডেক তাতে করিয়া বড়াই।
ভাঙ্গা ঢোল, ভাঙ্গা ঢাক, কাঁসর, সানাই,
তাতে জিত সুনিশ্চিত,—আর কাজ নাই!"

হোঁদল এর অর্থ কতটুকু বুঝল সে-ই জানে। গদ্‌গদস্বরে

বলল, "কুকুম্মাকে বলে আসি, মাষ্টার মশাই।" এবং তাঁর মতামতের অপেক্ষা না করে, থপ্‌থপ্‌ করে ছুটল।

খানিক বাদে ফিরে এসে জানাল, "কুকুম্মা ভারি খুসী হয়েছেন।"

"তুমি কি বলেছিলে?" মাষ্টার জিজ্ঞেস করেন।

মুলোর বাজার বসিয়ে হোঁদল বলল, "খালি লেখাপড়া নয়, আমাকে ঢাক, ঢোল শেখাবেন বলেছি। কুকুম্মা বললেন, খুব নায়েক মাষ্টার।"

"খ ই ক গ—শোনাও নি?"

"তাও শুনিয়েছি। বলেছি, মুখ দিয়ে ডেডাং ডেডাং, ধা-কুড়্‌কুড়্‌ বাজনা নয়,—ঢোল ঢাক কিনে দিতে হবে।"

মাষ্টার বললেন, "বেশ করেছ। করিতকম্মা ছেলে!

ছমাস পঠ লট পট।
অজ গজ বড় বট।

তোমার ত ঢাক ঢোলই বাজাতে হবে। তারপর চক্‌মকে পোষাক এঁটে জয়ঢাক।"

হোঁদল হাততালি দিয়ে বলে, "কি মজা! কুকুম্মা আপনাকে জল খেতে একটা টাকা দিলেন।"

টাকাটা পকেটে রেখে মাষ্টার বললেন, "খালি জয়ঢাক নয়, জগঝম্পও শেখাব। লম্ফঝম্ফ দিয়ে কুকুম্মাকে শোনাবে। তুমি যে কুষ্মাণ্ড হবে।"

কুষ্মাণ্ড কি হোঁদল জানে না। ভাবে প্রকাণ্ড দত্তি-দানা। সে বলে, "তার কাণ্ডকারখানা শেখান মাষ্টার মশাই।"

"অত শেখাবার বিদ্যে আমার নেই। তুমি ঝাঁটা চালাতে পটু হয়েছ, সে পাঠই নির্ঝঞ্ঝাটে চালাও।"

মাষ্টার মাসকাবারি মাইনে পেয়েছিলেন। যাত্রার দল থেকে আবার ডাক পড়েছিল। সেই গেলেন, আর এলেন না।···

তিন

রাত্রে হোঁদলের বাপ খেতে বসেছেন। ঠাকুরমা কাছে এসে, একগাল হেসে বললেন, "শুনেছ ভ্যাবল, হোঁদলের বিদ্যে!"

মগজে তখন দোকানের হিসেব। তিনি বললেন, "এখনি বিয়ে কি? আগে বড় হোক।"

"বিয়ে নয়,—বিদ্যে। ক'দিনে এমন লেখাপড়া শিখেছে যে, তাকে শেখাবার বিদ্যে মাষ্টারের নেই। তাই—"

ভ্যাবলরাম শুনবেন কি! তাঁর মাথায় তখন আলকাতরা ভেসে বেড়াচ্ছে। বিলেত থেকে জাহাজ-বোঝাই চালান এসেছে। তার নানান্ নমুনা। কোন্ মহাজনকে কতখানি বিলান হবে,—তার আগে কি মেশান দিয়ে বাড়ান যায়,—এ সব ভালো ভালো ভাবনার অন্ত নেই।

তিনি বললেন, "হুঁ।"

মা বললেন, "লজ্জা পেয়ে, মাষ্টার জিভ কেটে পিঠটান দিয়েছে। এখন খুঁজে পেতে আরও লেখাপড়া-জানা মাষ্টার বার কর। কাকে রাখবে?"

ভ্যাবলরাম ব্যবসার স্বপ্ন দেখছিলেন—জাহাজটা মহাজন টুনটুন্‌ওয়ালার কাছে বিক্রী করা মন্দ নয়।

তাঁর গলায় উত্তর ভেসে এল, "টুন্‌টুন্‌।"

মা বললেন, "সে ত চীনে সায়েব! বাঙ্গালী মাষ্টের চাই।"

ভ্যাবলরামের স্বপ্ন তখনো শেষ হয় নি। তিনি বললেন, "ঝুমুর"—অর্থাৎ ঝুমুরলাল!

মা নাক তুলে বললেন, "না, না, মেয়ে মাষ্টের পারবে না।"

ভ্যাবলরাম বললেন, "মোণ পিছু দশ আনা দু'পাই মুনাফা।"

মা বললেন, "দশ আনায় মাষ্টের পাবে না। দশ টাকা লাগবে।"

এতক্ষণে ভ্যাবলরামের হুঁশ হ'ল। তিনি বললেন, "খুঁজে দেখি, রোস।"

ক'দিন পর নূতন মাষ্টার এলেন। বিস্ময়-চিহ্নের মত টিঙ-টিঙে চেহারা, মুখে কাঁচা-পাকা মস্ত দাড়ি। হাওয়ার ছাটে পাক খেয়ে পড়েন।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক পুঁথি-পত্তর নাড়াচাড়া করেছেন। জেগে ও ঘুমিয়ে দিনরাত তাঁ নিয়ে নড়বড়ে চিন্তা।

চিন্তা করে করে মাথায় ছিট, অথবা মাথায় ছিট বলে দিনরাত্রি চিন্তা! তাই বেশী দিন কোথাও টিকে থাকতে পারেন না, কিন্তু যে ক'দিন থাকেন ছাত্রের মাথায় ঘুরপাক-চিত্র চোস্ত করে আঁকেন।

তিনি অঙ্কবিদ্‌। সব সময় অঙ্ক কষে দেখেন, সূর্য্যের আকর্ষণ ও সমুদ্রের ঢেউএর নাচন কমছে না বাড়ছে। কমছে দেখলে আঁতকে ওঠেন। কারণ সে অবস্থায় পৃথিবী আল্‌গা

পেয়ে রসাতলের দিকে গড়িয়ে যাবে। আর ততক্ষণে ঢালু বালুচরের উপর দিয়ে, আফ্রিকার গণ্ডায় গণ্ডায় গণ্ডার, গরীলা, সিংহ, বাঘ, হিপোপটেমাস্ এসে আশ মিটিয়ে সবার হাড়মাস-রক্ত খাবে!···

সেদিনও তিনি এ সব শক্ত গবেষণা করছিলেন। হঠাৎ বই হাতে থপ্‌থপ্ করে হোঁদল এসে হাজির। পরণে কালো হাফ প্যান্ট, গায়ে কালো হাফ সার্ট। মিশ্‌কালো গায়ের রংএ তা মিশে গেছে।

তার পায়ের শব্দে চম্‌কে উঠে তিনি চোখ মেলে দেখলেন, মুখোমুখি একটা গরীলা দাঁড়িয়ে আছে!

জ্যান্ত গরীলা তিনি চোখে দেখেন নি, দেখেছেন ছবি। স্বভাব প্রত্যক্ষ করেন নি, বইতে পড়েছেন। তাই যথেষ্ট। আর যাই করুক, তা ইষ্ট করে না। কাজেই তিনি আঁতকে উঠলেন। টেবিলের ঠেকা দিয়ে, কোনও গতিকে চেয়ার সমেত উল্টে পড়া আটকালেন।

তারপর যখন দেখলেন, হিংস্র সিংহ-বাঘের মত গরীলাটা দাঁত বার করল না, তখন ভরসা করে সুতো-বাঁধা চশমা দিয়ে তিনি তাকে নিরীক্ষণ করে দেখলেন। তারপর খানিক নিশ্চিন্ত হয়ে প্রশ্ন করলেন, "কি খাও?"

হোঁদল বলল, "দুধভাত, মোণ্ডা-মেঠাই।"

"আর কাঁচা মাংস?"

"খাই না। রাঁধা খাই।"

বাঁচোয়া,—কাঁচা-খেকো নয়, রাঁধা-খেকো। অর্থাৎ, আধা-বোষ্টম গরীলা,—হয়ত রাধাকেষ্ট নাম জপ করে।

জিজ্ঞেস করলেন, "রাঁধা মাংস আতপ চাল, কাঁচা কলা, সৈন্ধব লবণ দিয়ে খাও ? আর কতখানি ছাতু, ছোলা ?"

"খাই না ত। কুকুম্মা একাদশীতে খায়—"

পরিষ্কার বাংলা কথা। মানুষের ভাষা, গরীলার নয়।

তিনি ভরসা পেয়ে বলেন, "ঘি-দুধ ছানা-মাখন নানা গব্য, আর চব্য, চষ্য কতখানি খাও ?"

হোঁদল মাথা নেড়ে জানায়, অনেকখানি।

"বাপের টাকার মাপ নেই বুঝি ? তাই শরীরে অত চর্ব্বির ছাপ ! বাপ কি করে ?"

"আলকাতরার কারবার।—"

"তোমার আকার-প্রকারে তা টের পেয়েছি। কুস্তি কর, মুগুর ভাজ ?"

"না ত !"

"বুকডন, বটখিরি ক'টা করে নাও ?"

"একটাও না।"

"তা হলে দৌড়-ঝাঁপ, ঘোড়ায় চড়া ?"

"ভোজনের পিঠে চড়ি।"

"ঠিক ধরেছি। ভোজনের পিঠে উঠে শিবের গাজন। আথাল-পাথালে মেদমজ্জা ঢিলে হয়ে তাই ঢ্যাপসা থলথলে। কিন্তু মোটা হতে নাই,—তার অনেক বালাই। খালি পরকে ভয় দেখানো নয়, নিজেরও ভয় পাবার কথা ! ছুটতে গেলে পা পিছলে আলুর দম, আর বনে-জঙ্গলে বাঘ পিছু নেয়, তারা সাক্ষাৎ যম ! ঘরে বসেও কি ঝামেলা কম ! খামোখা খামোখা ঘাম !"

হোঁদল কুৎকুৎ

হোঁদল বলে, "আমি বনে বাদাড়ে কখনো যাই না। ঘেমে গেলে ভোজন ও ভজন হাওয়া করে। আর পা হিড়্কে পিপে গড়ান গড়িয়ে, হাতের নাগালে দড়ি, দাড়ি যা পাই আঁকড়ে ধরি। তাই মরি না।"

ঐ ওজন নিয়ে দাড়ি ধরে টাগ-অব-ওয়ার দস্তুরমত ভয় খাবার ব্যাপার। মাষ্টার তার নাগাল থেকে দাড়ি যথাসাধ্য সরাবার চেষ্টা করেন। তারপর নিরাপদ হবার জন্য বলেন, "নিজকে বাঁচাবার জন্য পরের দাড়ি ছেঁড়ার ঢের ঝকমারি, তাতে মারামারি হতে পারে। তাছাড়া ঢ্যাপসা মোটা হওয়া আহা মরি নয়। সব ঘরবাড়ী অনেক প্রাণীর জন্য তৈরী। জারিজুরি করে কোন্ অধিকারে মোটা শরীরে অনেক স্থান জুড়ে থাক? অপরকে লজ্জিত কর বলে মা বসুন্ধরা মুখ খাট করে। তা পাপ।"

হোঁদল নাকাল হয়ে ড্যাব্‌ড্যাব্ চোখে তাকায়। মাষ্টার বলেন, "পাপ থেকে মনস্তাপ। তা ধাপে ধাপে শরীর আর মগজ চেপে ধরে। তাই আমি মোটা হই নি। ইচ্ছা করলে পারতেম। আমি কৃচ্ছ্রসাধন করি।"

হোঁদল বোঝে না। জিজ্ঞেস করে, "কৃচ্ছসাধন কি? উচ্ছে-ভোজন? কুকুম্মা খায়। আমি খেতে পারি না। তেতো বলে থু করে ফেলে দি।"

"হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ—কৃচ্ছ্রসাধন জান না! একাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যায় উপবাস। ভাত নয়, রুটি নয়, জল নয়,—কিস্‌স্যু নয়। নিরম্বু।"

"খালি ডিম্ব! হাঁসের না পায়রার?"

মাষ্টার চটে মটে বলেন, "টিকটিকির।"

"তাতে পেট ভরে? টিকটিকির ডিম যারা খায় তারা টিকি রাখে?"

ভাগ্যিস্ মাষ্টারের মাথায় আবার আঁক এসে ঘুরপাক খেল। তিনি চটলেন না; ভরসা দিয়ে বললেন, "ঠিক হয়ে যাবে'খন। আমি বাতলে দিয়ে গড়ে তুলব। ততদিন অত নিকটে নয়।"

তবু হোঁদল কাছে ঘেঁসায়, আত্মরক্ষার জন্য তিনি ছাতাভাঙ্গা কাছে টেনে নিলেন।

লোহার ডাটের ভাঙ্গা ছাতা। ছেঁড়া, তালি-দেওয়া কাপড়ের আড়াল থেকে মর্‌চেধরা শিক ভয় দেখায়।

হোঁদল ভীতস্বরে জিজ্ঞেস করে, "ছাতা দিয়ে গড়বেন? তা হলে পড়ব না, কুকুম্মাকে বলে দেব।"

আঁক কষা থেকে মুখ তুলে মাষ্টার বললেন, "উহুঁ ছাতা দিয়ে নয়,—অঙ্ক কষে। তোমার বয়স কত?"

"আমার বয়স? আমাকে হতে দেখি নি ত। কুকুম্মা দেখেছেন। দাদা ডাকেন, তাঁর চেয়ে বড় বলে। ছোট হলে নাম ধরে ডাকতেন।"

"কুকুম্মা আবার কে?"

"আমার আব্বার হাম্বা।" হোঁদল গরব করে ঠাকুরমা'র মুখে শোনা নামকরণের ব্যাখ্যা বলে।

যুক্তিপূর্ণ তথ্য শুনে মাষ্টার কৃতার্থ হন। তৎক্ষণাৎ পোক্ত অঙ্ক কষে বলেন, "অদূর ভবিষ্যতে তুমি বিদ্যার মানোয়ারি পোত হবে।"

অর্থ না বুঝে হোঁদল বেকুবের মত তাকায়। মাষ্টার বিতং

করে বলেন, "ঠিক ছ'মাস ছ'দিন পর তুমি পণ্যের জাহাজ হবে। বিদ্যার পণ্য।"

এবার ভারি খুসী হয়ে হোঁদল বলে, "জাহাজ হব, গঙ্গায় ভাসতে পারব? কি মজা! সাঁতার জানিনে, তাই গঙ্গায় সাঁতরাতে পারি না। এবার ধন্য হব।"

সে-কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে মাষ্টার বলেন, "তিন দিনে যদি একটা বই শেখ, তা হলে এক মাসে শিখবে দশটা। আটাশ, উনত্রিশ, ত্রিশ, একত্রিশ দিনে মাস আছে। গড়পড়তা দশটাই ধর। তা হলে ছ'মাসে হ'ল গিয়ে ছ' দশং ষাট। ছ' মাস পেরিয়ে যদি এক বছরের পরমাই হয়, তা হলে হবে শকশো কুড়ি। এ হ'ল বইয়ের হিসাব। তারপর বইয়ের পৃষ্ঠা। একশো, দেড়শো, দুশো, তিনশো পৃষ্ঠার বই আছে। দাঁড়াও আঁক কষে বার করি।"

হোঁদল উৎসাহ পেয়ে একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। হঠাৎ নজরে আসায় মাষ্টার অঙ্ক থামিয়ে বলেন, "কাছে নয়, গোল হয়ে যাবে। দূরে সরে দাঁড়াও।" পেছনের দুয়ার খোলা আছে কিনা তিনি দেখে নেন।

'শত হস্তেন বাজীনাং' তিনি জানেন; পাজীনাং অর্থাৎ পাজীদের থেকে, ক'হাত দূরে থাকা প্রয়োজন তা জানেন না। পাঁজিতে তা খুঁজে দেখেন নি। তবু সাবধানের মার নেই। আর মার খাবার আগেই হুঁশিয়ার হওয়া দরকার।...

বয়স আন্দাজে হোঁদলকে অনেক ঢেঙ্গা দেখায়। এ বয়সের ও চেহারার ছাত্রের ঢঙ্ না জেনে ধমক দেওয়া বা ঠেঙ্গানো নিরাপদ নয়। তাই তিনি সে অপেক্ষায় নিজের অঙ্ক নিয়ে

রইলেন। তারপর মন থেকে দ্বিধা-শঙ্কা দূর হতে পাঠ দেওয়া শুরু করলেন।

"বাতাবী লেবু দেখেছ? কমলালেবু?"

ভালো ভালো ফলের নাম শুনে হোঁদল খুসী হয়। দাঁত দেখিয়ে বলে, "হিঁ। বল খেলেছি, খেয়েছি।"

"কি রকম দেখতে?"

"কি রকম দেখতে? বাতাবী লেবু হ'ল গিয়ে আমার মাথার মত, আর কমলালেবু মুঠোর মত।"—হোঁদল ঘুষি বাগিয়ে দেখায়।

তাতে খুসী না হয়ে, মাষ্টার মুখ খিঁচিয়ে বলেন, "কিসৃস্যু জান না। ওপরে আর নীচে চিড়ে চ্যাপ্টা। তা চোখে দেখ নি? পৃথিবী কেমন জান?"

হোঁদল দাঁত দেখিয়ে বলে, "জানিনে আবার? মজার জায়গা। আম আছে, জাম আছে, কাঁঠাল আছে। মাছ, মাংস, পোলাউ, মেঠাই, মিষ্টান্ন, দুধ, ক্ষীর, রসগোল্লা, রাবড়ি!"—হোঁদল জিভ দিয়ে পুরু ঠোঁট চাটে।

মাষ্টার চটে মটে বলেন, "পেট বাজিয়ে হোঁৎকা হয়েছ! পৃথিবী হ'ল কমলালেবুর মত গোল, উত্তর-দক্ষিণে চাপা। অনবরত ঘুরছে,—লাটিম যে রকম ঘোরে তেমন বন্-বন্ করে। ঘুরছেই ঘুরছে, দিন নেই, রাত নেই।"

"ঘুমোয় না?"

"উহুঁ,—খালি ঘোরে। সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র-পাহাড়, নদী-নালা, গাছপালা, বাড়ীঘর, জীবজন্তু সব,—বোঁ-বোঁ করে।"

হোঁদল অবাক হয়ে বলে, "হাম্ভা, কুকুম্মা, আব্বা, আমি?"

"সব, সব। ছাত্র মাষ্টার ডাক্তার বদ্যি কেউ বাদ নেই। আজ থেকে নয়, আদ্যিকাল থেকে। দিবা, রাত্রি এই ঘোরার ফল। শূন্যের উপর এমন ঘুরছে।"

লিক্‌লিকে হাত ঘুরিয়ে মাষ্টার দেখান। এ যেন মোয়া পাবার জন্য হাত ঘুরানো নয়, রোগা হাত ঘুরিয়ে মোটা হোঁদলের মাথা ঘুরাবার ফিকির!

হোঁদলের মাথা সত্যি ঘোরে। সে টেবিলটা দু'হাতে আঁকড়ে ধরে বলে, "উঃ এ কথা শুনে আমার মাথা ঘুরছে যে!"

মাষ্টার বললেন, "ঘুরবে না? মাথা আছে বলে ঘোরে। যদি না ঘোরে, বুঝতে হবে সে মাথা মাথা নয়।"

হোঁদল চোখ বুজে বলে, "আজ পড়তে পারব না মাষ্টার মশাই। বড্ড ভয় করছে। শূন্য থেকে ঘুরতে ঘূরতে পৃথিবী যদি নীচে পড়ে যায়! তখন কি হবে?"

সে ভয় পেয়ে মাষ্টারের কাছে এগিয়ে গিয়েছিল।

তিনি সরে যেয়ে বললেন, "কি আর হবে? সূর্য্যের আকর্ষণশক্তি জান না?"

"আকর্ষণ কি মাষ্টার মশাই?"

"তাও জান না! আকর্ষণ হ'ল টান। কাছি দিয়ে জাহাজ বাঁধার মত। তা আছে বলে পৃথিবী পড়তে পারে না,—ভেঙ্গে খান্‌ খান্‌ হয় না। দেখ নি কান ধরে টানলে মাথা সরে যায় না!"

অবশ্য সে অভিজ্ঞতা তার নেই, কিন্তু জাহাজের কাছির মত কাছে টানার ক্ষমতা সূর্য্যেরও আছে শুনে সে অবাক হয়। বলে, "তা ছিঁড়ে যায় না?"

মাষ্টার মুখ খিঁচিয়ে বলেন, "ওছা বুদ্ধি! তা কি ছেঁড়ার জিনিস? অঙ্কের কারসাজি বোঝ না? বাপের পয়সায় খালি জিভের হদিস খুঁজেছ! কিস্সু্য শেখ নি।"

হোঁদল কাতরস্বরে বলে, "আগের মাষ্টার বলেছেন আমি ঢের শিখেছি। আর শেখাবার বিদ্যে তাঁর নেই।"

আঁক কষা থামিয়ে মাষ্টার মুখ বাঁকালেন; বললেন, "বিদ্যে নেই বললেই হ'ল! সাহারা মরুভূমি দেখেছ? তার বালি? এপার নেই, ওপার নেই,—ধূ ধূ বালি। হেঁটে যাও, ষ্টীমারে যাও, ট্রেনে যাও,—সে গুড়ে বালি। খালি অঙ্ক কষে উটের পিঠে চেপে যেতে পার। কিন্তু সে বিদ্যে শিখেছ? উহুঁ। এমন কত বিদ্যের চোরাবালি আছে। তার কিস্সু্য শেখ নি! আসলে মাথায় ঘিলু নেই। ওখানে দাঁড়াও,—এখান থেকে মাথায় টোকা মেরে, আঁক কষে বার করি, ক'কিলোগ্রাম ঘিলু আছে।"

হোঁদলকে কাছে ডাকার ভরসা নেই। দূর থেকে গোটা কয়েক টোকা তার মাথায় ছুঁড়ে মেরে তিনি আঁক কষলেন। তারপর জাঁক করে বললেন, "যা বলেছি। নেই। তবু আরও পরখ করে দেখি। দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদ জান?"

দাঁতভাঙ্গা প্রশ্ন হলে কি হয়, হোঁদল অবলীলায় বললে, "জানি মাষ্টার মশাই। জ্বর হলে দৈ ত বাদ দিতে হয়। এ হ'ল গায়ের গরমের কথা। আর বাইরের গরমে দৈ বাদ দিতে নেই। তা হ'ল গিয়ে অদৈতবাদ।"

এমন উত্তরে মাষ্টার দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, "কচুপোড়া খাও। শোন দ্বৈতবাদ আর অদ্বৈতবাদ হচ্ছে—"

এ পর্য্যন্ত বলে, তিনি ট্যাক থেকে একটা টিনের কৌটা বার করলেন। তা তিনটা টোকা মেরে খুলে, এক টিপ নস্য নাকের ছেঁদায় গুঁজলেন। তারপর কটা হাঁচ্চো হাঁচ্চো শব্দ করে চোখ বুজে শক্ত-পোক্ত বক্তৃতা শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পর যখন চোখ মেললেন, দেখলেন ছাত্র নেই,—শূন্য আসরে মিথ্যাই তিনি মুক্তো ছড়িয়েছেন!

কি আর করা। তিনি একেবারে পাত্‌তাড়ি গুটিয়ে নাক টিপে দেখলেন, কোন্ ছেঁদা দিয়ে নিঃশ্বাস বইছে। মনে মনে আওড়ালেন, "নিঃশ্বাসে মিলিয়ে পা.

যথা ইচ্ছা তথা যা।—"

অর্থাৎ, গাড়ীর চাকার তলায়, মোষের শিংএ, সিংহের মুখে কোথাও যাবার পরোয়া নেই। ঠিক প্রাণে বাঁচবেন।—তাঁর নস্যির অভ্যাস। এক এক সময় এক এক নাকের ছেঁদায় চোখ বুজে তিনি অনেক নস্য গাঁদেন। আর সে ছেঁদা নিঃশ্বাসে বাধা দেয়। অপর ছেঁদা দিয়ে নিঃশ্বাস পড়ে। আর তা মিলিয়ে তিনি পা বাড়ান। এবার ডান নাকের ছেঁদায় নস্যি গাঁদায়, বাঁ ছেঁদায় নিঃশ্বায পড়ল। আর তা মিলিয়ে তিনি বাঁ পা বাড়ালেন।

কিন্তু ক'পা এগুতে টিকটিকি ডাকল—টিক্‌টিক্। সে ডাকের পর একটু বসে না গেলে ঠিক বিপদ আসে। তিনি ফিরে এসে খানিক চুপ করে বসলেন। আবার পা বাড়াতে এল হাঁচি। নতুন নস্যি কিনে এনেছিলেন। হয়ত তা বিচুটি জাতীয়। তাই নাক চুটমুট করে খালি হ্যাঁচ্‌চো!

হাঁচি আর টিকটিকি দুইই মানতে হয়। না মানার অনেক

ঝক্কি! কি আর করা? আবার ফিরে এসে বসলেন। খানিক বাদে এ সব বাধা থেকে মুক্তি পেয়ে, তিনি রাধাকৃষ্ণ স্মরণ



করলেন। তারপর ফাঁক বুঝে নিঃশ্বাসের সঙ্গে পা মিলিয়ে বেরুলেন।

চার

মাষ্টারের ঘোরাল-প্যাঁচাল কথা শুনে হোঁদলের মাথা সত্যি ঘুরেছিল। সে ঘরে এসে সটান বিছানায় শুয়ে পড়ল। বুড়ো ঠাকুরমায়ের চোখে ছানি, ভালো দেখতে পান না। কিন্তু তা হলে কি হবে? আদুরে নাতি হোঁদল তাঁর চোখের মণি।

তিনি কাছে এসে ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কি হয়েছে রে দাহুমণি ? শুয়ে পড়লি কেন ? শরীল খারাপ হয়েছে ?"

হোঁদলের মনে হচ্ছিল, চোখ মেলে সে দেখবে, ঘর-দোর, জানালা-কপাট, কড়িকাঠ ও বেবাক জিনিসপত্র ঠক্‌ঠক্ করে নড়ছে,— তামাম পৃথিবী ঘুর্‌ছে বন্‌-বন্‌ করে ! সূর্য্যের সঙ্গে টানা শনপাটের দড়ি গেছে ছিঁড়ে। এখন রসাতলে যেতে হয়ত বাকি নেই।

সে চোখ না মেলে কুকুম্মাকে সে-কথা জানাল।

ঠাকুরমা তার কপালে হাত দিয়ে, ভীত স্বরে বললেন, "ঈস্‌ গা পুড়ে যাচ্ছে। তাই পেলাপ বকছিস্‌।"

হোঁদল মাথা নেড়ে বলল, "জ্বর নয়, পেলাপ নয়। বলছি পৃথিবী ঘুরছে। সঙ্গে আমার মাথাও ঘুরছে।"

ঠাকুরমা তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, "পিরথিমী ঘুরুক। কিন্তু তোর অমন মাথা ঘোরে কেন ?"

"আছে বলে ঘোরে। তোমার ঘোরে না ?"

ঠাকুরমা মাথা নেড়ে বলেন, "উঁহু।"

হোঁদল বলে, "তা হলে তোমার মাথা মাথা নয়। পৃথিবী ঘুরছে, সব ঘুরছে,—আর মাথা ঘুরবে না ?"

ঠাকুরমা বলেন, "তা ত সবদিন ঘোরে না। কবে ঘুরবে পাঁজিতে লেখা থাকে। মা বসুমতী বাসুকী সাপের ফণার উপর বসে আছেন। বাসুকীর মেহন্নত কম নয়। তাই তাঁকে নাবিয়ে গা ভাঙ্গতে হয়। তখন বসুমতী কেঁপে ওঠেন। ভূমিকম্পো হয়। আর শঙ্খ-ঘণ্টা বাজালে বাসুকী স্থির হয়ে মা বসুমতীকে ফণায় বসিয়ে দেন। ভূমিকম্পো থামে।"

কিন্তু এ কথা হোঁদল মানে না। বলে, "তুমি জান না কুকুম্মা। মাষ্টার মশাই কত বই পড়েছেন। কত কথা জানেন। শুনে মাথা ঘোরে—।" তারপর গলায় ঢাক বাজিয়ে সে ডাকে, "ভোজন, ভজন!"

ওরা চিৎকার শুনে ছুটে আসে।

হোঁদল বলে, "চট্ করে মশারি টানিয়ে দাও। খাটটা বেঁধে দাও কাছি দিয়ে কড়িকাঠের সঙ্গে। ছাদ ভেঙ্গে গেলে মশারি আটকাবে,—চাপা পড়ব না। আর খাট কড়িকাঠে গিঁঠ দেওয়া থাকলে রসাতলে গড়াবে না।"

বাহারে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা!

ঠাকুরমা অবাক হয়ে বললেন, "আহারে দাহু। এমন যাহুর খেলা কে শেখাল?"

হোঁদল গদ্‌গদ হয়ে বলল, "ভাগাভাগি করে শিখেছি, কুকুম্মা।—খানিক মাষ্টার থেকে, খানিক মাথা থেকে। দেখ না মাথা আছে বলে কেমন ঘোরে।"

তখন ঠাকুরমা ভয় খেয়ে বলেন, "সত্যি ভূমিকম্পো শুরু হ'ল নাকি? মাষ্টের নিচ্চয় ভালো পাঁজি দেখে। তোর অমন মাথা, তাও ঘোরে। হরিবোল, হরিবোল,—ভূমিকম্পো।—হে মা বাস্থকী,—উলু উলু উলু।"

তাঁর মনে হ'ল শরীর টলছে। তিনি বসে পড়েন। উলু শুনে হোঁদলের মা ও ঝি-চাকর এসে হাজির হয়।

ঠাকুরমা বলেন, "ভূমিকম্পো। হরিবোল। শাঁক বাজাও, উলু দাও।"

কেউ শঙ্খ, কেউ কাঁসর-ঘণ্টা বাজায়।

সঙ্গে সঙ্গে হোঁদল বিছানা থেকে তড়াক্ করে লাফিয়ে নীচে নামল। কড়িকাঠে মাকড়শার ঝুল ছিল। দম্‌কা বাতাসে সেগুলো এলোমেলো হয়ে ঝুলে পড়ায় সে মনে ভাবল ছাদ রসাতলের দিকে নেমে আসছে! অমনি সে ঢুকল খাটের তলায়।

দেখাদেখি অপরেরা তাড়াহুড়োয় কেউ টেবিলের তলায়, কেউ বেঞ্চির নীচে—যে যেখানে পারল ঢুকে পড়ল। কতক বাইরে ছুটতে গিয়ে পা পিছলে আলুর দম!

যম পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে এই আতঙ্ক। ভূমিকম্প সত্যি শুরু হয়েছে কিনা হিসাব নেই। ওরা সবাই কাঁপতে লাগল। ওদের ধাক্কা লেগে ঘরের আসবাবপত্রও কাঁপল। পৌষের শীত মোষের গায়, মাঘের শীত বাঘের গায়,—আর ভয়ের শীত পায়ে পায়ে এসে, ওদের ছেয়ে ফেলেছিল!

অনেক পরে কাঁপুনী থামল। তখন আরম্ভ হ'ল জটলা, জল্পনা-কল্পনা। যে ভূমিকম্প হয়েছে তা ওদের হিসাবে অল্প না। নিশ্চয় অনেক বাড়ীঘর ভেঙ্গে তছনছ হয়েছে।

দালানের আল্‌সেতে থাকত চড়ুই পাখী। ছোট্ট হলেও তাদের বৃহৎ পরিবার। সুচতুর,—ফুরুৎ করে আসে, ফের বেরিয়ে যায়। দোর আটকালে জানালা দিয়ে, গুলগুলি দিয়ে গলে। বাড়ী তৈরীর ঝঞ্ঝাট নেই, ভাড়া গোনার ঝামেলা নেই। ওরা পৃথিবীর আকার জানে না, বাহার জানে না। ভূমিকম্পের ঘাড় নাড়া বোঝে না। কিন্তু হট্টগোলে ভড়কে গেল। পাখসাট মেরে বাইরে যেতে, ওদের পাখার সাপট লাগল ঝালর-লণ্ঠনে। সেকেলে বাড়ীতে শখ করে টানান হয়েছিল। অনেকদিন পরখ করে দেখা হয় নি।

দড়ি পচে গিয়েছিল। একদিন জোয়ান লোকে টেনে ছিঁড়তে পারত না। আজ ঐটুকুন ছোট্ট পাখীর গোত্তা লেগে, ছিঁড়ে গেল! ঝালর-লণ্ঠন মেঝে পড়ে, ঠুন্‌ঠুন্ আওয়াজ তুলে চূরমার হ'ল।

সঙ্গে সঙ্গে আবার চিৎকার উঠল, আর চারধারে সবাকার পালাবার হিড়িক। দিক্‌বিদিক্ ভুলে ঠাকুরমা ও হোঁদল দু'জনেই ছুটেছিল। ঠোকাঠুকি হয়ে ঠাকুরমা পড়লেন নীচে, আর হোঁদল উপরে। ভয়-ভাবনায় দু'জনেই যেন কানা হয়েছিল। একজন আর একজনকে চিনতে পারল না। ভাবল নির্ঘাৎ ছাদ ভেঙ্গে ওরা কুপোকাৎ হয়েছে।

ঠাকুরমা আর্ত্তনাদ করে উঠলেন, "নারায়ণ, অপমিত্যু হ'ল। হরিবোল, হরিবোল।"

বিপদে শ্রীমধুসূদন নাম স্মরণ করে বিপদ এড়ান যায়। কিন্তু হোঁদল সে নাম ভুলে, কঁকিয়ে বলল, "গন্ধমাদন, গন্ধমাদন!"

অনেকক্ষণ পর তাদের মনে হ'ল, মরণ হয় নি। শমন কানের কাছ দিয়ে চরণ ফেলে গেছে, কিন্তু কান ধরে টানে নি! ধড়ে প্রাণ এলে ওরা দেখল, সোরগোল শুনে পাশের গোলবাড়ীর লোকেরা এসেছে। ঠাকুরমা হরিবোল বুলি শুনিয়ে বললেন, "তোমাদের ভালোমন্দ হয়নি ত বাছা?"

"কিসের ভালোমন্দ ঠাকুরমা?" ওরা জিজ্ঞেস করল।

"ভালো না হোক, মন্দ হবার কি বাকি আছে? সন্ধ্যে অবধি চোখ বন্ধ করে ছিলে নাকি? যা ভূমিকম্পো হয়ে গেল!" —ঠাকুরমা ঠেস্ দিয়ে বললেন।

"ভূমিকম্প!" অবিশ্বাসভরা প্রশ্ন শোনা গেল।

"হাঁ বাছা, ভুমিকম্পো। হরিবোল, হরিবোল। কম্পো-জ্বরের মত কাঁপুনা। আমার ধর দেড় কুড়ি বয়স হবে,—এমন 'সাংখাতিক' ভূমিকম্পো আর দেখি নি।"



ও বাড়ীর লোকেরা বলল, "কৈ আমরা ত টের পাই নি!"

ঠাকুরমা গালে হাত দিয়ে বললেন, "বল কি বাছা! তা কুম্ভোকন্নের মত যদি ঘুমোও কি করে জানবে? সব ভেঙ্গে তছনছ। আমাদের ঝাড়-লণ্ঠনটা ভেঙ্গে চুরমার! অমন যে

হোঁদল, সেও মাথা ঘুরে আছাড় খেল। ওর মাষ্টের বলেছে, পৃথিবী বন্‌-বন্‌ ঘুরছে।”

যে পড়শী মেয়েটি কলেজে বিজ্ঞান পড়ে, সে বলল, “তার সঙ্গে ভূমিকম্পের কি সম্পর্ক ঠাকুরমা?” সে ভূমিকম্পর কারণ বোঝাতে যায়।

ঠাকুরমা মুরুব্বিয়ানা করে বলেন, “তুমি মেয়েছেলে, বুঝবে না বাছা। হোঁদল অনেক লেখাপড়া শিখেছে, সে বোঝে।” ··

পাঁচ

সত্যি হোঁদল সোজাসুজি বুঝে নিয়েছে। সেই থেকে সে মস্ত ছাতা মাথায় দিয়ে চলে। মশারির অনেক ঝামেলা। তা দিনের বেলা গুটানো থাকে। ঘণ্টা না বাজিয়ে, কখন ঘটা করে ভূমিকম্প দুর্ঘটনা ঘটাবে, তার নিশানা নেই।

তার চেয়ে ছাতা ঢের ভালো। স্প্রিংএর ছাতা। বোতাম টিপে দাও, সড়াৎ করে খুলে যায়। মশারির চেয়ে মজবুত। তার তলায় শরীর গুটিরে জুৎ করে বস, জিৎ হয়ে যাবে।

সে ঠাকুরমাকে বলে বাপের মারফত মস্তবড় স্প্রিংএর ছাতা আনাল। শক্ত কাপড়,—ডবল ছাউনী দিয়ে পোক্ত করে গড়া। হোঁদলের কাছে তা যেন ভক্তের ভগবান! সে চিৎ হয়, কাৎ হয়, উঠে-বসে, পায়খানায় যায়, স্নানে যায়, খায়, শোয়—সব সময় ছাতা সাপের ফণার মত মাথার উপর মেলা থাকে। পৃথিবী ঘোরে,—ভূমিকম্পের তোড়জোড়ে ছাদটাদ ভেঙ্গে পড়লে আটকাবে। রসাতলে যাওয়া ঠেকাবে—তা ছাড়া আফ্রিকার গণ্ডার, সিংহ, বাঘ রুখবে। অনেক নিশ্চিন্ত!

কিন্তু তাতে মশা রোখা যায় না; আবার মশারির তলায় অতবড় ছাতা মেলা সম্ভব নয়। তাই খাটের তলায় ইট দিয়ে উঁচু করে বিছানা, মশারি, ছাতা, একসঙ্গে ব্যবহার চলে কিনা পরখ করে দেখে।…

মাষ্টার পড়ার ঘরে বসে খবর পাঠালেন। প্রকাণ্ড নতুন ছাতা মাথায় হোঁদল থপ্‌থপ্‌ করে হাজির হ'ল।

মাষ্টার নিবিষ্টমনে নিত্যকার মত আঁক কষছিলেন। তিনি হাওয়া-আফিসের কতক খবর কাগজ থেকে জোটান, কতক নিজের মগজে ফোটান। মগজেরটা বেশী মজাদার! সূর্য্যের আকর্ষণ, সমুদ্রের প্লাবন গ্রহসম্মিলন—নানান রকম তথ্য। তার বেশীর ভাগ ভূয়ো, যৎসামান্য সত্য। তবু তা দিয়ে অঙ্ক কষার অকথ্য নেশা!

দূরদুরান্ত নিয়ে তার হিসাব-নিকাশ; কিন্তু নিতান্ত আশ-পাশের ব্যাপারের হদিস নেই। মাথার উপরে দুটো বোলতার ঝগড়া হচ্ছিল। খোলতাই ভাবে দুটোতে জাপ্‌টা-জাপ্‌টি শুরু করল। তারপর লুটোপুটি খেয়ে পড়ল মাষ্টারের দাড়ির বেড়াজালে। একটা কেমন করে খসে গেল, কিন্তু অপরটা আটকাল। মাষ্টার টের পেল না।

মারামারিতে বোলতাটার মোটেই জুৎ হয় নি, তারপর দাড়িতে আটকবন্দী! বেরুবার ফটক-ফন্দী না পেয়ে বোলতাটা বিষম চটে গেল। ছুটোপুটি করে যাই মাষ্টারের ঠোঁট তার হুলের কাছে ঠেকল, দিল কুটুস্‌ করে বিঁধিয়ে। এ ভাবে রাগের খুঁতখুঁতি হাল্‌কা করে উড়ে গেল।

কিন্তু সিধকাঠির চেয়েও শক্ত খোঁচা,—রাম ফোঁড়! নাম-

ভোলান কামড়। উহুহুঁ করে মাষ্টার ধড়মড়িয়ে উঠলেন। কোকিলের কান-জুড়ানো মিঠে স্বর নয়,—বসন্তের গুটির জোরাল উহুহুঁ জ্বালা!

ঠিক এমন সময় মাষ্টার দেখলেন, একটা কিম্ভূত জানোয়ার তাঁর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে। কালো শুশুকের মত গোলাকার। যেন জল ছেড়ে ডাঙ্গায় উঠে, চমৎকার পোজ দিয়েছে।

বোলতার হুল আর তার চোখের ভুল প্রায় একসঙ্গে মগজে এল। তাতে এমন পরিবেশের সৃষ্টি হ'ল যে, তিনি ছুটিকে আলাদা করে ভাবার অবসর পেলেন না। ভাবলেন ঐ বিকট জানোয়ারটাই তাঁকে কামড়েছে!

ছাতার আড়ালে ঢাকা হোঁদলকে তিনি দেখেন নি। খেয়াল নিয়ে থেকে দেখতে চেষ্টা করেন নি। তাই বিষম ভড়কে গেলেন। তাঁর মনে হ'ল বালুচরের উপর দিয়ে সত্যিকারের জানোয়ার এসে পোঁছেছে।

তিনি "ওরে বাবারে" বলে চেঁচালেন। তারপর পালাবার জন্য উঠতে চেষ্টা করতে, তাড়াহুড়োয় তাঁর ঠ্যাং ছুটোর ধাক্কা লাগল টেবিলে। ফলে চেয়ার সহ উল্টে মেঝেতে পড়লেন।

লম্বা দাড়ি পড়ল চেয়ারের তলায়, আর তার উপর তাঁর শরীরের ভার। তিনি মুখ টেনে দাড়ি বার করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তা বেরুল না,—ক'গাছা দাড়ি ছিঁড়ে চোখে জল বার হ'ল!

মাথা নীচে, পা উপর দিকে,—সে অবস্থায় তিনি পা ছুড়তে লাগলেন। পায়ের লাথি লাগল খোলা কপাটের পাটে। আর তা বারংবার খটাং খটাং করে বন্ধ হতে আর খুলতে লাগল।

মজাদার নয়,—হোঁদলের মগজে ব্যাপার ঘোরাল মনে হ'ল। নিশ্চয় ভূমিকম্প শুরু হয়েছে। সে তাড়াতাড়ি ছাতা সহ টেবিলের তলায় আশ্রয় নেবার চেষ্টা করল।

কিন্তু তার খোলা ছাতা ত আর ব্যাঙের ছাতার মত যা-তা নয়। টেবিলের তলায় যাবার নামে তা ব্যঙ্গ করল। দামে ভালো, নামে ভালো, জাতে ভালো, ধাতে ভালো,—কালো রূপে আলো করা ছাতা। মানুষের মাথায় ফণা ধরে তা ছত্রপতি বানিয়ে দেয়।

কিন্তু তার অমন গুণপনা না মেনে, হোঁদল টেবিলের তলায় টানাটানি করল। তখন দু-পক্ষে শুরু হ'ল টানাহ্যাঁচড়া, হানাহানি; আর তার ফলে কখন কি জানি, টেবিলসহ কাৎ হয়ে, হুড়মুড় করে হোঁদল পড়ল মাষ্টারের উপর।

তখনও মাষ্টার প্রাণপণে পা ছুড়ছেন। তাতে বোঝার উপর শাকের আঁটি। তিনি কারণ খুঁজলেন না,—বুঝবার দিক দিয়ে গেলেন না। পরিপাটি লাথি চালালেন। অমন লাথিতে রাজার হাতীও ইতিউতি ছোটে। হোঁদল ছিটকে পড়ল একদিকে, ছাতা অন্যদিকে। সেখানে ছিল পুরু দেয়াল। তাতে ধাক্কা খেয়ে হোঁদল নাজেহাল হ'ল।

এমন বেহাল অবস্থায় কিছু আঁকড়ে ধরে সামলাতে হয়। হাতের সামনে পড়ল মাষ্টারের দাড়ি। আর হোঁদল তাড়াতাড়ি তা শক্ত করে ধরল। মাষ্টার তা ছাড়াবার চেষ্টা করলেন। তখন শুরু হ'ল হুটোহুটি, লুটোপুটি, গুঁতোগুঁতি।

মাষ্টারের বেজায় চক্ষুলজ্জা। তাই চোখ বুজে চিন্তা করেন, আঁক কষেন, পড়ান। তিনি চোখ মেলে চাইলেন না। অনুমান

করে নিলেন, বড়মানুষেরা কুকুর ও ঘোড়ার মত গরীলাও পুষে থাকেন। হয়ত কখন তার একটি খাঁচা ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছে! এ তারই বুনো আক্রমণ! অথবা এমনও হতে পারে যে, সমুদ্র শুকিয়ে যাওয়ায় জংলী পশুর এক জাদরেল প্রতিনিধি ঘর অবধি



এসেছে! অঙ্ক কষা তার পেশা নয়,—তা শেখার নেশাও নেই। দাঁত দিয়ে পা ঘসে, রক্ত শুষে সে পরখ করে দেখবে—মানুষের শরীরে কত হাড়, মাংস, মেদ, মজ্জা আছে,—কতখানি রক্ত—এবং তা বাড়ছে না কমছে। ওদের মধ্যেও অঙ্কবিদ্ ও বৈজ্ঞানিক আছে কিনা কে জানে?…

তা যাই হ'ক, পৈতৃক প্রাণ এ যাত্রায় গেছে। আর চেষ্টা-চরিত্র করে কোনও গতিকে যদি টেকান যায়, তা হলে এ বাড়ীর ফটকে কপাল ঠেকিয়ে দণ্ডবৎ। এই বদ্‌খত বাড়ীতে আর নয়!···

এমন সব কথা ভেবে, কি ভাবে রক্ষা পাওয়া যায় সে চেষ্টায় তিনি প্রাণপাত শুরু করলেন। চেষ্টার অসাধ্য নেই। টানা-হ্যাঁচড়ায় কিছু দাড়ি বাইরে এল, যেগুলো অবাধ্য সেগুলো রয়ে গেল।

মাষ্টার মশাই জানেন, সর্ব্বনাশ এলে অর্দ্ধেক ত্যাগ করা পণ্ডিতের নিয়ম। সে বিষয়ে শ্লোক আছে—

'সর্ব্বনাশম্ সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।'

ঠিক গুণে গুণে নয়, অনুমানে অর্দ্ধেক দাড়ি তিনি ত্যাগ করলেন। কিন্তু এ ত্যাগ সোজা নয়। দস্তুরমত লড়ে আধাআধি ভাগ। পট্‌পট্ করে দাড়ি ছিঁড়ল, ঠক্‌ঠক্ করে শরীর কাঁপল। তারপর থট্‌থট্ করে দে ছুট!

চশমা ভেঙ্গেছিল, নস্যির ডিবা চ্যাপ্টা হয়েছিল, একপাটি চটি ফস্‌কে গিয়েছিল। সেসব এবং ভাঙ্গা ছাতা ও অঙ্কের খাতার মায়া ছেড়ে দিয়ে, মাষ্টার ঘোড়দৌড় শুরু করলেন।

কে জানে জানোয়ারটার শূওরের গোঁ কি না? তিনি এঁকে-বেঁকে ছুটলেন। কখনও তাঁর ছায়া আগে কায়া পিছে, কখনও কায়া আগে ছায়া পিছে। কায়া ও ছায়ার রেস!

পথে চেনা লোক প্রশ্ন করে, "কি হ'ল মাষ্টার?"

তিনি ছুটতে ছুটতে উত্তর দেন, "সূর্য্যের আকর্ষণ আর সমুদ্রের জলপ্লাবন কমছে। কমছে মানুষের পরমায়ুর ভরসা।

ছুটে আসছে বুনো গরীলা, গণ্ডার, হিপোপটেমাস। ত্রাসের কথা। ছোট, ছোট।"

ছুটে ছুটে তাঁর গলা কাঠ হয়ে তেষ্টা পায়, তবু বহু কষ্টে ছোটেন।

প্রশ্নকর্ত্তারা বিব্রত হয় না; বলে, "বুড়ো মাষ্টার আঁক কষে কষে ক্ষেপে গেছে!"...

ছয়

মাষ্টার মশাই এ বাড়ীতে দণ্ডবৎ জানিয়ে গেছেন। হয়ত নাকে খৎও।

মাষ্টার মশাই আর ফিরলেন না। দামী দামী জিনিস ফেলে গেছেন—মাইনেও। কিন্তু জান বাঁচলে তবে উপার্জ্জন।

ঠাকুরমা হোঁদলকে জিজ্ঞেস করেন, "মাষ্টার আসে না দাদা?"

হোঁদল জুল্‌জুলে চোখে চেয়ে বলে, "না কুকুম্মা। কেন যে আসে না! বিদ্যের জাহাজ বানাত। সিটি বাজিয়ে তোমায় নিয়ে গঙ্গায় বেড়াতাম।"

সে মুখে শব্দ করে জাহাজের চোঙার ও চলার শব্দ বোঝায়।

ঠাকুরমা আপশোষ করেন, "ঈস্, অমন মাষ্টের!"

"অমন হয় না কুকুম্মা। কত ভালো কথা শিখিয়েছিল। কিন্তু পৃথিবী যে ঘুরপাক খায়, কোথায় ছিট্‌কে পড়েছে কে জানে?"

কপালে হাত ঠেকিয়ে ঠাকুরমা বলেন, "হে মা বসুমতী, বাসুকীর ফণায় থির হয়ে বস মা। তোমার ভারে তার হাড়-

মুড়মুড় ব্যথা হওয়ায় বালিশ গরম করে সেঁকছিল। তাই ভূমিকম্পো হয়েছে। দয়া কয়ে এট্টুখানি আল্‌গা দিয়ে বস। দেখ হোঁদলের মাষ্টের কোথায় হারিয়ে গেল। আর কি খুঁজে পাওয়া যাবে?"

জানা যখন নেই তখন নতুন মাষ্টার খুঁজে আনার প্রয়োজন হ'ল। ঠাকুরমা ছেলেকে তাগিদ দিয়ে মাষ্টার আনালেন। কেষ্টবিষ্টু না হ'ক হোঁদলকে কেউ-কেটা করা চাই।

মস্ত বড় পণ্ডিত মাষ্টার, অথবা মাষ্টার পণ্ডিত এলেন। অর্থাৎ কাঁঠালের আমসত্ত্ব অথবা আমের কাঁঠালসত্ত্ব! একটি দিয়ে দুয়ের আস্বাদ!

ছড় দিয়ে তিনি বেহালা বাজান না, পেন্সিল দিয়ে তিনি অঙ্ক কষেন না। ছড় বা পেন্সিলের মত টিংটিংয়ে নন, দিব্যি মোটাসোটা নাদুস-নুদুস। টাক নেই, টিকি আছে—তার ডগায় বাঁধা রক্তজবা, চন্দনে চুবানো। তার মিঠে গন্ধে দু-চারটে বোলতা ভন্‌-ভন্‌ করে পিছু ফেরে। মধুভাণ্ড বলে ভুল করে গায়ে হুল ফোটাবে ভয়ে তিনি নামাবলীর বাতাস দিয়ে খেদান। তারা মনে দাগা পেয়ে খসে পড়ে। অন্য ফুল খুঁজে পেতে উড়ে বসে।

তাঁর কপালে রক্তচন্দনের বড় ফোঁটা। গলায় বাহুতে সুতোয় গাঁথা মোটা মোটা রুদ্রাক্ষের গোটা।

পোক্ত শাক্ত লোক,—তন্ত্রশাস্ত্রে অফুরন্ত ঝোঁক।

পূর্ব্বে পুজো-পার্ব্বণে, অন্নপ্রাশনে, পৈতে, বিয়ে, শ্রাদ্ধে বিলক্ষণ প্রাপ্তি ছিল। কিন্তু সম্প্রতি এমন অলুক্ষণে দিন এল যে, গোটা হিন্দুজাতটা নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে—দেবদ্বিজে ভক্তি-

শ্রদ্ধা নেই, পূজো-আর্চ্চায় নিষ্ঠা নেই,—নমো নমো করে দায়-খালাস!

তিনি আগের দিনের সঙ্গে বর্ত্তমানেয় তুলনা করে মনে মনে আপশোষ করেন।

আগের দিনে ধামাভরা সিধে পেতে একটুও অসুবিধে ছিল না। যজমানরা দরাজ হাতে দিত। মায়ের কাছে নিবেদন করা হ'ত হাতীর বাচ্চার মত তেলে-চর্ব্বিতে ভরতি পাঁঠা। উৎসর্গ করার আগে তিনি টিপে দেখতেন, তাতে ক'সের তেলের বড়া হবে। কম বুঝলে বলতেন, "মাকে ঠকিও না।" আর অমনি দৌড়, দৌড়,—ভক্তরা ছুটত, দামের জন্য আটকাত না। সেরা পাঁঠা জুটিয়ে আনত। বলির পর নিজেরা ছিঁটেফোঁটা প্রসাদ নিয়ে, প্রায় গোটা পাঁঠাটাই রেখে যেত পুরুতের জন্য। আর তিনি ভরাপেট খেয়ে, ভরামনে আশীর্ব্বাদ করতেন। পোক্ত করে ভক্তির কাঠামো গড়ত বলেই আখেরে ওরা জিতে যেত। সেটা সত্যি যুগ ছিল!···

আর এখন এই কলি যুগে ওরা বলিই তুলে দিতে চায়। যা দেয় তা কণ্ঠা-বার-করা, বাজারের সস্তা পাঁঠা। কুণ্ঠাভরা নিবেদনে ঘেন্না ধরে। ও পাঁঠা রান্না করা পণ্ডশ্রম। আবার তা থেকে ভাগ চায়! বলে, "ঠাকুর মশাই, ভক্তি করে যা দেওয়া যায়, তাতেই মহাশক্তির পরম তুষ্টি। আর প্রসাদ নিতে হয় কণিকামাত্র।" আবার শোন কথা, পেটুকগুলো বলে কিনা, রাঁধা প্রসাদ খেতে বাড়ী বয়ে আসবে। এ যেন গাধার আব্দার!

আরও দুঃখ করে তিনি ভাবেন, কতক উজবুক শিষ্য শাস্ত্রের

বচন শোনায়—মাংসে হিংসা, ক্রোধ এসব তমোগুণ বাড়ায়। অতএব বামুন-পুরুতের খেতে নেই।

আরে হস্তিমূর্খ, তোরা শাস্ত্রের কি জানিস্? তোরা হলি গণ্ডূষ জলমাত্রেণ সফরি ফরফরায়তে। অর্থাৎ কিনা অল্প জলের পুঁঠিমাছের মত ফর্‌ফর্‌ করে বেড়াস। গভীর জলের খবর কতদুর রাখিস্? তোদের ছোট মুখে কিনা বড় বড় রাঘব বোয়ালের বোলচাল! আরে বেকুব, ব্রাহ্মণ কি বস্তু জানিস্? ব্রহ্ম থেকে যার সৃষ্টি,—অতবড় সগর বংশটা চোখের আগুনে যারা ধ্বংস করে দিল, তারা তমোরিপু ভস্ম করতে পারে না? একরত্তি পাঁঠার শক্তি আছে যে ব্রাহ্মণের পেটে ঢুকে তমোৎপত্তি করবে? ছ্যা ছ্যা কি সব দেউলে চিন্তা!...

তিনি পড়ার ঘরে কাঠের আসনে কুশাসন পেতে বসে, এমন সব নানা কথা ভাবছিলেন। নিষ্ঠাবান মানুষ, যেখানে যান হাতে কুশাসন থাকে।

হোঁদল তখন বাইরে খেলছিল। ঠাকুরমা একাই এলেন। তাঁর বামুন পণ্ডিতের চেহারা দেখে গড় করে প্রণাম করে, মেঝেতে বসলেন। পণ্ডিত মশাই গড়গড়িয়ে তাঁকে অনেক তত্ত্বকথা শোনালেন। শুনে তাঁর চোখ ছল্‌ছলে হ'ল। তিনি বললেন, "এদ্দিনে মাষ্টারের মত মাষ্টার পেলাম। আমার নাতি হোঁদলরামকে খালি লেখাপড়া নয়, ধম্মকম্মও শেখাবেন। যেন একটা কেউ-কেটা হয়।"

পণ্ডিত মশাই আশ্বাস দিয়ে বলেন, "তা হবে'খন। ছাত্র কোথায়?"

পণ্ডিত মশাই এদিক-ওদিকে তাকান। তাঁর চোখে

ছানি, তাই ঝাপ্‌সা দেখেন। ছাপ্পান্ন বছর বয়স, কিন্তু বয়স কমিয়ে বলেন বেয়াল্লিশ। চোখে চাল্‌শে ধরেছে,—সেরে যাবে। শাস্ত্রে নাকি আছে পঞ্চাশের বেশী বয়স হলে, সংসার ছেড়ে ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য বনে যেতে হয়। কিন্তু তিনি খাইয়ে লোক,—আস্ত খাসী খুসী হয়ে খান। ব্রাহ্মণী বেঁচে আছেন,—নানা রকম মাংস আর মিষ্টান্ন, রেঁধে খাওয়ান। বনে গেলে কে আর সেসব জিভগলান খাবার খাওয়াবে? খেতে হবে ফল-মূল। তারপর শাকালু বলে ওলকচু খেলেই চিত্তির! এ কথা ভাবতে তাঁর গলা চুটমুট করে।

ঠাকুরমা বললেন, "হোঁদলরামকে ডেকে আনি।"

তিনি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। কালো রঙের প্রতি হোঁদলের বংশগত ভালোবাসা। সে কালো হাফ প্যাণ্ট, গেঞ্জি ও জুতো পরেছিল।

পণ্ডিত মশাই মোটা ও আয়েসী মানুষ। একটু ফাঁক পেলে ঝাঁক বেঁধে আসার জন্য ঘুমকে জাঁক করে নেমন্তন্ন জানান। শোওয়া, বসা, সব অবস্থাতেই তিনি ঘুমুতে জানেন। যারা জানে না তারা ভাবে তিনি ধ্যান করেন।

ঠাকুরমা ছানিপড়া চোখে ভালো দেখেন না। হোঁদল দেখেও টের পায় না। সে কুকুম্মার পিছু পিছু নতুন মাষ্টারের কাছে আসে।

লিকলিকের পর ঢ্যাপসা মোটা মাষ্টার এসেছে। এ আবার কেমনতর কে জানে?

কুকুম্মা বলেন, "পণ্ডিত মশাইকে ভক্তি করে পেন্নাম কর হোঁদল!"

হোঁদল ভয়ে ভয়ে পা টিপে এগোয়। ততক্ষণে পণ্ডিত মশাই চেয়ারে পা তুলে জোড়াসন করে বসেছিলেন। হোঁদল তাঁর পায়ে প্রণাম করতে যেয়ে সুড়সুড়ি দিয়ে ফেলে।

ইচ্ছা করে নয়,—অনিচ্ছায় সুড়সুড়ি! তার হাতে পায়ে ছয়টা করে চব্বিশটা আঙ্গুল। শরীর অনুপাতে আঙ্গুল মোটা আর তাতে জাঁদরেল নখ। বাঁধা নাপিত, অতিরিক্ত মজুরি দিতে হয় না। তবু ঠাকুরমা কাটতে দেন না, যদি সোনার শরীরে নরুণের ঘা বসিয়ে দেয়। কাজেই নখগুলো তাঁকে দেখিয়ে দেখিয়ে বড় হয়েছে!

পায়ের তলায় সেই নখের প্রণাম সাংঘাতিক সুড়সুড়ি—পণ্ডিত মশায়ের তড়কা ছুটে গেল।

ঠাকুরমা জানালেন, "নিয়ে এসেছি পণ্ডিত মশাই।"

পণ্ডিত মশাই বললেন, "বেশ করেছেন। আপনার মতিভক্তি আছে। সামনে শ্যামাপুজো। চমৎকার হবে। কালোবর্ণ প্রশস্ত। এটি ঘরের বুঝি?" তিনি ছাত্রের কথা ভুলে গেলেন।

"হাঁ, এটি ঘরের। সবেধন নীলমণি,—আর নেই।"

"না থাক,—এই একটিই দশটি। মায়ের খুব তুষ্টি হবে। ভক্তিমান ঘর,—যত্ন করে রত্ন তৈরী করেছেন।"

"আমরা কি তা পারি? তাই ত আপনার আশ্রয়ে ফেললাম। এর কল্যাণে কি পুজো করতে বলেন?"—ঠাকুরমা ভক্তিভরা গলায় জিজ্ঞেস করেন।

"নিশ্চয়। মায়ের পুজো ছাড়া কি মুক্তি আছে? সুকৃতির ফলে জীবের হয় উর্দ্ধগতি। ওরা ত তা বোঝে না। করিয়ে

নেবেন, তাতে পুণ্যি হয়। আমি পাঁজি থেকে প্রশস্ত দিন স্থির করব,"—পণ্ডিত মশাই যুক্তি দিয়ে বলেন।

ছাত্র পড়াতে এসে যাজনীর উপুরি পাওনার আশায় তিনি খুব খুসী হলেন। কতখানি চর্ব্বি আর মাংস আছে তা অনুমান করার জন্য তিনি হঠাৎ হোঁদলের পেটে জোরে একটা টিপি দিলেন।



রামটিপি! ব্যথা পেয়ে হোঁদল চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল। তার গলায় পাঁঠার ভ্যা-ভ্যা আওয়াজ নয়,—'ওরে বাবারে' শব্দ! এমন তাজ্জব ব্যাপারের জন্য পণ্ডিত মশাই তৈরী ছিলেন না। তিনি একেবারে স্তব্ধ হয়ে যান। অবাক হয়ে বলেন, "কথা বলে যে! কি করে শেখালেন?"

ঠাকুরমা গর্ব্ব করে বলেন, "শেখাতে হয় নি, আপনি শিখেছে। সর্ব্বদিকে এমন তুখোর ছেলে মেলে না। আমাকে ডাকে কুকুম্মা, মাকে হাম্বা, আর বাবাকে আব্বা।"

তিনি চোখমুখ ঘুরিয়ে সে সব ডাকের অর্থ বোঝান।

কিন্তু পণ্ডিত মশাই বুঝবেন কি? তিনি ভাবেন, দুর্ভাগ্য তাঁর মাথায় বোঝা হয়ে এসেছে। শনি ঘাড়ে চাপায় নলরাজার কাছ থেকে পোড়া শোল মাছ জ্যান্ত হয়ে পালিয়েছিল। তাঁকে তেমনি জব্দ করতে চর্ব্বিঠাসা নাদুস-নুদুস জানোয়ারটা পাঁঠার বদলে হয়ে গেল কিনা মানুষের বাচ্চা! এমন কেচ্ছা খেউর হয় বলেই রাক্ষসেরা চটে মটে মানুষ ধরে আচ্ছা করে খায়!

সাত

তবু পণ্ডিত মশাই দুঃখ সামলে নিলেন। তিনি গো-পণ্ডিত নন, নিজের স্বার্থের শাস্ত্র তাঁর ভালোমত জানা ছিল। হোঁদলের কুকুম্মার হাঁদামি তিনি ঠাহর করেছিলেন। তাঁকে অনেক ধর্ম্ম-কথায় ভিজিয়ে বললেন, "এ ছেলেকে কেউ-কেটা বানাবার জন্য ঘটা করে কালীপূজা করুন। ওর একটু ফাঁড়া আছে। মায়ের হাতের খাড়ায় তা কেটে ফেলুন।"

একথা শুনে ঠাকুরমা রাজী হয়ে গেলেন। পণ্ডিত মশাই তাই চেয়েছিলেন। তিনি বড় ঠাটের হাটবাজার, মোটাসোটা পাঁঠা ও দক্ষিণার ফর্দ্দ করলেন। তা মঞ্জুর হতে লেঠা হ'ল না। সেজন্য প্রথমেই তিনি বোঝালেন, 'দেবায়, ব্রাহ্মণায় চ।' অর্থাৎ কিনা, দেবতা ও ব্রাহ্মণে এক ওজনে ভক্তি। তারা দু'জনেই সমান,—এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। আর এ দু'জনকে দেখলে দেখ্ দেখ্ করে স্বর্গলাভ!

তাঁর মুখের ফুলঝুড়ি থামে না। তিনি তুড়ি মেরে বলেন,

"দেবতা ও ব্রাহ্মণের দয়া ছাড়া অব্রাহ্মণের গতি নেই। কিন্তু দেবতা থাকেন অনেক দূরে,—স্বর্গে। আর তাঁদের প্রতিনিধি হয়ে ব্রাহ্মণ থাকেন কাছে ভিতে। তাঁরাই হাত বাড়িয়ে নেন।"

হোঁদল ও কুকুম্মা হা করে তাঁর কথা শোনে। তা তাদের মনে গেঁথে যায়।

পণ্ডিত মশাই খুসী হয়ে ভাবেন, তাঁর পোয়াবার হ'ল,—লাভের ঘড়িতে বারটা বাজল।

কিন্তু তাঁর বাড়া ভাতে ছাই পড়ে গেল। তিনি তা টের পেলেন ঘটা করা কালীপূজা সেরে! পূজোয় অনেক দক্ষিণা ও সিধে লাভ হয়ে লোভ বাড়ায়, তিনি এ বাড়ীতে পূজা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করলেন। স্বর্গের তেত্রিশ কোটি দেবতার কথা শুনিয়ে তাদের ক'টিকে ঠাকুরঘরে বসালেন। তারপর সেখানে পুরুত হয়ে জেঁকে বসলেন। শুরু করলেন পূজো-আর্চ্চা, কথকতা। স্বর্গের ইন্দ্রসভা, নন্দন-কানন, পারিজাত ফুল, উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়া, ঐরাবত হাতীর কথা শুনে হোঁদলের মন মেতে উঠল। দেবতাদের পূজা-মান্যে পুণ্যলাভ হলে স্বর্গে গিয়ে ধন্য হওয়া যায়,—এমন কথা মনে মনে গুণে হোঁদল পড়া ছেড়ে পণ্ডিত মশাইর সঙ্গে ঠাকুরঘরে ধন্না দিল।

তখন চালু হ'ল লাভ-লোকসানের হালচাল! অনেক দেবতার অনেক ভোগ-রাগ, নৈবেদ্য চালকলা ও দক্ষিণা। ঝোলা ভরে, টেঁক ভারী হয়। কিন্তু দু-দিন যেতে পণ্ডিত মশাই দেখেন, তার ঝক্কি-ঝামেলা, টেক্‌টেকি কম নয়!

তিনি 'নমো, নমো' করে পূজা সারেন। চোখে ছানিপড়া

কুকুম্মাকে এড়ান ; কিন্তু হোঁদলফে পারেন না ! তার মগজ যতই দুর্ব্বল হ'ক, পুজোর ব্যাপারে সে সোরগোল বাধায়। সে সব দেবতার ষোড়শোপচারে পুজোর আব্দার করে। অথচ অত দেবতার কাছে মন্ত্র পড়া, ঘণ্টা নাড়া কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার ! মুখ ধরে যায়,—হাত টন্‌টন্, পা কন্‌কন্, মাথা বন্‌বন্ করে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়, কিন্তু জলপান করার যো নেই। হোঁদল স্মরণ করিয়ে দেয় যে, পুজোর ঠাটে বসে সে পাঠ চলে না।

অগত্যা পণ্ডিত মশাই মনে মনে মন্ত্রপাঠ করেন। কিন্তু তাতে হোঁদল মনে করিয়ে দেয়, "চেঁচিয়ে পড়ুন মাষ্টার মশাই। দেবতা শুনতে পান না।"

পণ্ডিত মশাই বলেন, "দেবতার মনে কান আছে, শুনতে পান।"

হোঁদল বলে, "আমার নেই। আমাকে শোনান।"

শোনাবেন কি, তিনি তার মুণ্ডপাত করেন। কিন্তু ঠাকুরমা দরাজ হাতে পাওনা-গণ্ডা বাড়িয়ে দেওয়ায় তাঁর মনের দরজা খোলা থাকে। তিনি জানেন, পেটে খেলে পিঠে সয়। আবার পিঠে এমন কায়দায় গড়তে হয় যে পেটে গিয়ে তা পুট্‌পাট্ না করে।

তিনি বুদ্ধি খাটিয়ে পুজো ও মন্ত্রপাঠের মাপ খাটো করে দেন ! হোঁদলকে বোঝান, "কাঠফাটা রোদে দিন মোটাসোটা হয়, হাঁড়-কাপানো শীতে হয় লিক্‌লিকে। তেম্‌নি হয় পুজো-আর্চ্চা, তন্ত্রমন্ত্র। এ সব হ'ল গিয়ে দেবতার মন্ত্রের কারসাজি। যদি না মান, পাজি বলে ভগবান বেজায় গররাজি হবেন।"

হোঁদল পাঁজিপুথি ও সাক্ষী-প্রমাণ খুঁজে দেখে না। সোজাসুজি রাজী হয়।

পণ্ডিত মশাই তখন ওস্তাদ বাজিকরের মত ছুঁচোবাজির খেল দেখান। পড়ার ঘরে বসে হোঁদলকে দ্বিতীয় দফার পাঠ দেন,

" 'মাতৃবৎ পরদারেষু'—অর্থাৎ কি না—"

বোঝাবার আগেই হোঁদল প্রশ্ন করে, "পরের দুয়ারকে ?"

পণ্ডিত মশাই মাথা নেড়ে বলেন, "উহুঁ হুঁ হুঁ। পরদার মানে হ'ল পরের দার। দার হ'ল গিয়ে স্ত্রী—"

হোঁদল অবাক হয়ে বলে, "দার ত দুয়ার,—কাঠ। ঘোমটা নেই, শাঁখা-সিঁদুর নেই, অথচ—"

পণ্ডিত মশাই দ-এর তলার ব-ফলায় জোর দিয়ে বোঝান, "দ্বার হ'ল দুয়ার, আর দার হ'ল স্ত্রী। পরদার মানে পরের স্ত্রী। তাকে মাতৃবৎ অর্থাৎ মায়ের মত দেখবে। তারা মায়ের অংশ।"

হোঁদল প্রশ্ন করে, "আমার মায়ের ?"

পণ্ডিত মশাই বলেন, "হাঁ হাঁ। তা একই কথা। সব স্ত্রীলোক জগজ্জননীর অংশ। জগজ্জননী হলেন মহামায়া, মা কালী, শ্যামা, চণ্ডী।"

"আমি একা দেখব ?"

"তুমি একা কেন ? তুমি, আমি, সব্বাই।"—পণ্ডিত-মশাই গা ভেঙ্গে 'মা, মা' করে উঠলেন।

হোঁদল বলল, "বুঝেছি।"

পরদিন পণ্ডিত মশাই নিত্যকার মত পড়াবার ফাঁকে এক হাত ঘুমিয়ে নিচ্ছিলেন। এ সুযোগে হোঁদল দুষ্টুমিতে মাতে।

বড় বাড়ী। জানালার ওপিঠে নানা গাছগাছড়া। ক'টা বানর এসে গুলজার করছিল। হোঁদল তাদের ছড়া কেটে বলল,

"ও বানর কলা খাবি,
জয়জগন্নাথ দেখতে যাবি ?
বড় বোয়ের বাপ হবি,
একটি করে পয়সা পাবি।—"

বানরেরা তাতে রাজী নয়। রোজ রোজ তারা পেট বোঝাই করে ফল-পাকড় খায়। এমন লোভ তাদের কাছে ধোকড় ! তারা ভেংচি কাটে। হোঁদলও ছেড়ে কথা কয় না।

তাতে পণ্ডিত মশাইর মাথাব্যথা নেই। তিনি এ ফাঁকে জাঁকাল স্বপ্ন দেখেন। তিনি দেখলেন, যেন ছেলেবেলায় তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে, মা পাশের বাড়ী গেছেন। আর এ সময় একটা গেছো বানর এসে তাকে পেছিয়ে ধরেছে। তিনি ভয় পেয়ে শব্দ করেন, "মাগো, মা !"

তাঁর স্বপ্নের কথা হোঁদলের কানে যায় নি। গেল তার মা ডাক। ভয়-মাখান সে আওয়াজ তার মনে বাজল। সে বুঝল, অনেকক্ষণ মাকে না দেখে তার মন কেমন করছে। আহা, তাঁর মাকে খোঁজা দরকার। সে তখন বাঁদরের সঙ্গে বাঁদরামি ছেড়ে তাঁর মাকে খোঁজা শুরু করল।

এমন সময় ঝাড়ু-বালতি হাতে বুড়ী মেথরাণী এ বাড়ীর পায়খানা সাফ-সাফাই করতে এসেছিল। চেয়ে চেয়ে হোঁদল এই একটি স্ত্রীলোকই দেখতে পেল। কাজেই সে অনুমান করল, নিশ্চয়ই এ মাষ্টার মশায়ের মা। ছেলেকে বহুক্ষণ না দেখে তিনি হন্তদন্ত হয়ে এসেছেন এবং মাষ্টার মশায় 'মা, মা'

বলে তাঁকে ডাকছেন। আর যদি আপন মা না হয়েও থাকে, পরের স্ত্রীও যখন মাতৃবৎ, তিনি আলবৎ তাঁকে ডাকছেন।

এ যুক্তিতে মাষ্টার মশায়ের দুঃখ মুক্তির জন্য হোঁদল জানালা দিয়ে মেথরাণীকে হাতছানি দিল। সে কাছে এলে বলল, "মা, তোমার ছেলে ডাকছে।"

মুনিবের ছেলের মুখে মিঠে মা ডাক শুনে সে গলে গেল। বলল, "হামারা বেটা বোলাতা? উ কিধার?" (আমার ছেলে ডাকছে? সে কোথায়?)

হোঁদল পণ্ডিত মশাইকে দেখিয়ে বলল, "ঐ যে উধার।" (ঐ ত ওখানে।)

মেথরাণী চেয়ে তার পেছনে দেখতে পায়।

এখন বুড়ীর একমাত্র ছেলে বহুদিন আগে ঘর ছেড়ে বিরাগী হয়ে গিয়েছিল। কি নিয়ে রাগারাগি হয়েছিল। বুড়ী ভাবল, হয়ত রাগ পড়ে যেতে সে ফিরে এসেছে। লজ্জায় নিজের বাড়ী না গিয়ে বাবুর বাড়ীতে এসেছে। রুজি-রোজগারে লায়েক হয়ে আসায়, বাবুর বাড়ীর কুরশীতে (চেয়ারে) বসেছে।

সে খুসীতে সব কিছু ভুলে এগিয়ে এল। তখন খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে বাড়ীর চাকর-বাকর ঘুমিয়ে পড়েছে। কেউ তাকে বাধা দিল না। মেথরাণী ঝাড়ু-বালতি হাতে সরাসরি ঘরে ঢুকে পড়ল।

পণ্ডিত মশাই চেয়ারে বসে ঘুমুচ্ছিলেন। মেথরাণী পেছনের দোর দিয়ে এসেছিল। তাঁর পেছন সে দেখতে পেল। ভাবল, ভালো ভালো জায়গার জল খেয়ে তার ছেলে থলথলে হয়েছে।

ঠিক সে সময় পণ্ডিত মশাই শব্দ করলেন, "মা, মা!" তা মেথরাণীর কানে তার ছেলের স্বরের মত লাগল।

আর যায় কোথায়? "আরে মেরা জান, আরে মেরা কলিজা, আরে মেরে বেটা" (আমার প্রাণ, আমার হৃৎপিণ্ড, আমার ছেলে) বলে সে তাকে পেছন থেকে জাপটে ধরল।



পণ্ডিত মশায়ের তড়কা ছুটে গেল। হঠাৎ এমন আটঘাট-বাঁধা আক্রমণের জন্য তিনি তৈরী ছিলেন না। তিনি চমকে উঠে, ধমক মেরে নিজকে ছাড়াতে চেষ্টা করলেন। আর মেথরাণী ভাবল, ছেলের কেটে পড়ার মতলব। তাকে আটকান

দরকার। তাড়াহুড়োয় ঝাঁটা ও ময়লার বালতি নামিয়ে রাখার কথা তার মনে রইল না। তা নিয়ে তাদের ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু হ'ল। পণ্ডিত মশাই ছাড়াতে চান, আর মেথরাণী ছাড়তে চায় না। দস্তুরমত দু কুস্তিগীরের ধ্বস্তাধ্বস্তি! তাতে বালতি উল্টে সব ময়লা পড়ল পণ্ডিতের গায়ে, মাথায়। মলের বিটকেলে গন্ধ!

ঘুমের আনন্দ ভেঙ্গে এমন মন্দ অবস্থায় পড়ে সব কিছুর ছন্দ পতন হ'ল। পণ্ডিত মশাই ওয়াক্ থু করে বাইরে গোঁ দিলেন, আর মেথরাণী থ বনে গেল। এবার তাকে দোসরা লোক ঠাহর করে সে গালে হাত দিয়ে বললে—

"তাজ্জব কি বাত!
একহি ছুরত, একহি কিসিম,—
আওয়াজ ভি ওহি সাথ!"

(অবাক কাণ্ড! এক চেহারা, সে সঙ্গে গলার শব্দ!) ছেলে ত মিললই না, এবার মল সাফ-সাফাইর ঝামেলা।

হোঁদল ব্যাপার দেখে খসে পড়ল।...

দু'দিন আর পণ্ডিত মশায়ের পাত্তা নেই। হয়ত তিনি গোবর, সোডা ও সাবানে প্রায়শ্চিত্ত করছিলেন।

সে ফাঁকে কুকুম্মার কাছে আব্দার করে হোঁদল চিড়িয়াখানা দেখতে গেল। সঙ্গে ভজন ও ভোজন। ঠাকুরমা তাদের পই-পই করে সাবধান করে দিলেন, তাকে যেন বানর-ভোদড়ে আচড়ে কামড়ে না দেয়। ছোট বড় পাঁচমেশালী পশুপাখী দেখে হোঁদল মহাখুসী। কি ফেলে কি দেখে? হনুমান, জাম্বুবান, ভালুক, শিম্পাঞ্জী দেখে, সে বাঘের খাঁচার কাছে

যায়। ডোরাকাটা রয়াল বেঙ্গল টাইগার দেখে ভজনকে জিজ্ঞেস করে, "কম্বল গায়ে এটা কি গা?"

ভজন বলে, "বাঘিনী।"

"তা আবার কি?"

ভজন পরিচয় দেয়, "বাঘ আছে ত? ইনি তার পরিবার,—ইস্ত্রী, বাঘিনী।"

হোঁদলের মনে পড়ে, 'মাতৃবৎ পরদারেষু'। পরের স্ত্রী যখন মায়ের সামিল, বাঘের স্ত্রীও তাই। আহা, জ্বরে কাঁপুনী হচ্ছে, তাই কম্বল গায়ে দিয়েছে। বিস্বাদ বলে সাবু-বার্লি খায় নি। এট্টু ভাজাভুজি পেলে খুসী হবে। কে আর দেখতে যাচ্ছে?

যাই ভাবা, সে ঠোঙ্গাভরা ভাজাভুজি সমেত হাত খাঁচার ভেতর গলিয়ে বলল, "ডাক্তার কাছে-ভিতে নেই। এই বেলা চট্ করে খেয়ে নাও মা। টাটকা ভাজা, কুড়মুড়ে। মজা করে খাও।"

বাঘিনীর চোখ বোজা ছিল। চোখ মেলে তার সন্তানের থলথলে দেহ দেখল। দেখে স্নেহ উথলে উঠল। সে দাঁড়িয়ে উঠে ঠোঁট চাটল, তারপর তাক করে মারল লাফ!

ভাগ্যি ভজন হ্যাঁচকা টানে হোঁদলকে সরিয়ে এনেছিল, নৈলে বাঘিনী মা তাকে ঘাড় মটকে ভোজন করত!

শিকার ফস্‌কে যাওয়ায় বাঘিনী রাগে গর্জ্জাতে লাগল। আর হোঁদল ভয়ে কেঁচো হয়ে ভজন ও ভোজনের সাথে সরে গেল।

সে বুঝল, সব্বার স্ত্রীই মা নয়, তার রকমফের আছে।

চিড়িয়াখানা মাথায় থাক, এখন মানে মানে ঘরের ছেলে সোজা ঘরে ফিরতে পারলে রক্ষা। তারা তক্ষুণি বাড়ীতে রওনা হ'ল।

আট

গঙ্গায় স্নান-তর্পণ করে ও গায়ে চন্দন লেপে শুদ্ধ হয়ে, পণ্ডিত মশাই আবার হাজির হলেন। সেদিনকার ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হয়ে লাভ নেই। বরং সুদশুদ্ধ আদায়ের চেষ্টা বুদ্ধির কাজ। আগের দেওয়া পাঠ লোপাট হওয়ায়, তিনি তার পরেরটা আঁটসাট করে দিলেন, 'পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ'।

হোঁদল জিজ্ঞেস করল, "লোষ্ট্র কি মাষ্টার মশাই? উষ্ট্রের আর এক নাম?"

"উহুঁ,—লোষ্ট্র মানে ঢিল—মাটির ঢেলা। পরদ্রব্যেষু মানে পরের জিনিসে, লোষ্ট্রবৎ মানে মাটির ঢেলার মত দেখবে। বুঝলে?"

"হুঁ। আমি ত ওরকমই দেখি। ঢেলাতে লোভ করব কেন? তা খেতে বিছ্‌ছিরি।"

তার পিঠ চাপড়ে পণ্ডিত মশাই বললেন, "ইয়া! বাপের পয়সা বল, আর মায়ের পয়সা বল, সব লোষ্ট্র। কখনো তাতে লোভ টোভ যেন না হয়। হাতে এলে আমার কাছে নিয়ে আসবে। একলব্যের কথা জান? দ্রোণাচার্য্যের ছাত্র ছিল। ভারি সভ্য ছেলে। সে আঙ্গুল কেটে গুরুকে দক্ষিণা দিয়েছিল।"

"আঙ্গুল কেটে! রক্ত বেরোয় নি? তার চেয়ে লোষ্ট্র দিলেই হ'ত।"

গোলমেলে কথা। তা সরল করা দরকার। পণ্ডিত মশাই বললেন, "তা হ'ত। কিন্তু সে খুঁজে পায় নি।"

হোঁদল বলল, "ভারি হাঁদা ত! পথঘাট থেকে কুড়িয়ে নিতে পারে নি?"

পণ্ডিত মশাই সে কথা চাপা দিয়ে বললেন, "সেখানে লোষ্ট্র পাওয়া যেত না,—সব কাদা।"

হোঁদল বলল, "ও!" কিন্তু তার হাঁদা মগজে পাক খেয়ে তা হয়ে পড়ল এম্নিতর। তা পণ্ডিত মশাইকে কাঁদিয়ে ছাড়ল।

মাসের শেষে পণ্ডিত মশাই মাইনে পেয়েছেন; সঙ্গে পূজার্চ্চনার জন্য সিদে। নতুন টিনের কৌটা, থলে ও গামোছায় গুচ্ছের জিনিস।—বড়লোকের বাড়ী, তায় সস্তা গণ্ডার দিন। আলো চাল, কাঁচা মুগডাল, কাঁচকলা, আলু, পটল, উচ্ছে, সরষের তেল, ঘি, চিনি, বাতাসা, শশা, নারকেল, লেবু, আনারস, ফুঁটি, আরও অনেক কিছু, তা ছাড়া পনেরটি রূপোর টাকা। টাকাগুলো তিনি নামাবলীর খুঁটে বেঁধেছেন।

মন ভরা, তাই চোখ ভরে ঘুম এল। ঘুমপাড়ানী মাসী-পিসীদের আম-কাঁঠালের লোভ দেখাতে হ'ল না। মোটা মানুষ, তার নাকের বড় ছেঁদা। তা দিয়ে হাপরের মত অনেক হাওয়া ঢোকে আর বেরোয়। আর নানা ছাঁদে টিকাড়া-নাকাড়া বাজে। বেজে বুঝিয়ে দেয়, তিনি পড়াচ্ছেন, অর্থাৎ বসে বসেই গড়িয়ে নিচ্ছেন।

হোঁদলকে তিনি হাতের লেখা শিখতে দিয়েছিলেন। অক্ষর লিখতে হোঁদলের বেশ কিছু সময় লাগে। কাগের ঠ্যাং, বগের

ঠ্যাং আর সাপ-ব্যাঙের ঢঙ্ ফোটাতে কসরৎ কম নয়। তাতে মেহনত হওয়ায় সে উঠে সেদিনের মত জানালায় দাঁড়াল। আজ নতুন দৃশ্য চোখে এল।

একটা গাছের ডালে প্রকাণ্ড বড় মৌচাক ঝুলছে।

দেখে মহাভারতের গল্প মনে পড়ল—অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদের কথা। কুকুম্মার মুখে শোনা। লক্ষ্যভেদ করে অর্জ্জুনের নাম হয়েছিল। চেষ্টা করলে তারও হতে পারে। কিন্তু তার তীরধনুক নেই। ঘরের বাইরে যেতে না পেলে ইটপাটকেলও জোটান যায় না। তা হলে কি করা?

হঠাৎ পণ্ডিত মশায়ের সিদেবাঁধা ঝোলা ও গামোছার দিকে তার দৃষ্টি পড়ল। হয়ত সেখানে তীরধনুক অস্ত্রশস্ত্র বাঁধা আছে। দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে লক্ষ্যভেদ শিখিয়েছিলেন। তিনি বামুন, পণ্ডিত মশাইও তাই। দু'জনের পৈতা, টিকি আছে—ভেদ নাই। হোঁদল চেয়ে দেখল সত্যি তাই। পণ্ডিত চেয়ারে মাথা এলিয়ে, টিকি ঝুলিয়ে হা করে ঘুমিয়ে আছেন। পৈতাগাছা ভুড়িতে লেপটে আছে।

তিনি ঘুমিয়ে আছেন, থাকুন। এ সময়ে তাঁর ঝোলা থেকে তীরধনুক খুলে মৌচাকে তাক করা মন্দ কি? হয়ত শিষ্যের কীর্ত্তি দেখে তাঁর স্ফূর্ত্তি হবে। তা ছাড়া তাঁর সংস্কৃতের ছড়া মগজে ভরা ছিল। পরের জিনিস ঢেলার মত ভাবা গুরুবাক্য। চেলার তা পালা উচিত। আর যায় কোথায়?

সে কুৎকুতে চোখে ফের চেয়ে দেখল, তিনি নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছেন। নামাবলীর খুঁটেবাঁধা টাকাগুলো তাঁর কোলের

উপর রাখা। সে তা সাবধানে খুলে নিল। রূপোর টাকা—সে বেবাক হাতরাল। তা দিয়ে তাক করলে লক্ষ্যভেদের ফাঁক থাকবে না।

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে সে টাকাগুলো মৌচাকে ছুঁড়তে লাগল। শন্‌শন্‌ করে ছোঁড়া, কিন্তু ঢ্যাপসা হোৎকা শরীর নিয়ে নিশানা হয় না। টাকাগুলো পাক খেয়ে এলোমেলো ছোটে, মৌচাকের কাছে-ভিতে নয়। এ ভাবে সব টাকা ফাঁকা হ'ল, তারপর আলু, পটল, শশা, মুলো, কলার পালা। তবু চাকে লাগল না। তখন হোঁদলের জেদ চাপল। সে ক্ষেপে গিয়ে পণ্ডিত মশায়ের সব কিছু ছোঁড়া শুরু করল। নারকেল, বাতাবি লেবুতে না হওয়ায়, অবশেষে আনারস। শেষ বেশ। আনারসটা পড়ল মৌচাকের ঠিক মধ্যখানে। সাধনা সফল হ'ল, মান বাড়ল—হোঁদলের মন আনন্দে কানায় কানায় ভরল। সে একপাক নাচল। ওদিকের ব্যাপার খেয়াল করল না।

মধুভরা হলে কি হয়, আসলে মৌচাক হ'ল হুলঠাসা মৌমাছির দুর্গ। সে দুর্গ খামোকা ভাঙ্গায় মৌমাছিরা বেজায় চটে গেল। এ জুলুম সইতে ওরা মোটেই রাজী নয়! মৌরাণী আক্রমণের হুকুম দিলেন। আকাশ-যুদ্ধে ক্রুদ্ধ মৌমাছিরা বেরিয়ে এল। ওদের ঝাঁকে ঝাঁকে এরোপ্লেন, গুন্‌-গুন্‌ ভ্যান্‌-ভ্যান্‌ যুদ্ধের বাজনা। কোনও বাধা না মেনে, ভন্‌-ভন্‌ করে উড়ে ওরা জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকল। তারপর হোঁদলকে চাঁছা-ছোলা হুল ফোটাল—কুট্টুস-কুট্টুস!

চাক ভেঙ্গে মৌমাছি ক্ষেপিয়ে হোঁদল যে ভুল করেছিল,

এবার সুদে-আসলে তার মাশুল দেবার পালা। সে "বাবারে গেছিরে" বলে ভালুকনাচ নেচে পালাবার পথ খুঁজল। এক কোণায় মস্ত একটা সিন্দুক ছিল। তার ডালা খুলে সে ঢুকে পড়ল।

মৌমাছিরা তাকে পাতি-পাতি করে খুঁজল। তারপর তাকে না পেয়ে তার মাষ্টারকে ছেঁকে ধরল। ওরা গুরুশিষ্য বোঝে না। শিষ্য বুড়ো হয়ে গুরু হয় হয়ত।

তাদের হুল খেয়ে পণ্ডিত মশাই জেগে উঠলেন। গা ভেঙ্গে মা বলা হ'ল না। শত্রুব্যূহে পড়ে মা কেন, তিনি বাপের নাম ভুললেন।

কুটুস্, কুটুস্, কুট্টুস্ কামড়—তিনি হুঁস হারালেন। মাথায়, ঘাড়ে, নাকে, মুখে, হাতে, পিঠে, পেটে—কোথাও বাকি নেই।

তাঁর মস্ত টিকির ডগায় ফুল বাঁধা। টাটকা ফুল। তিনি ভাবলেন, ফুলে মধু আছে। নইলে শুধু শুধু মৌমাছি ভিড়বে কেন? ওদের ভিড় ভাঙ্গার জন্য তিনি চেঁচিয়ে বললেন, "এ টিকির ফুল, গাছের নয়! এ ফুলে মধু নেই।"

কিন্তু ওরা শোনে না, কুট্টুস্ করে কামড়ায়।

"আচ্ছা, পিছু ছেড়ে দাও বাবা, গোটা ফুলই দিচ্ছি।" পণ্ডিত মশাই একটানে ফুল ছিঁড়তে গিয়ে ত্রস্ত হাতে টিকির ক'গাছা উপড়ালেন। তারপর চো-চা দৌড়। মৌমাছিরা খানিক তাড়া করল। আছাড় পড়ে পণ্ডিত মশাইর ছুটো নড়বড়ে দাঁত খসে গেল।···

ওদিকে সিন্দুকের ভেতর থেকে হোঁদল চেঁচাতে লাগল।

বড় সিন্দুক হলে কি হয়, বাচ্চা হাতীর মত তার শরীরের তুলনায় তা ছোট। তা ছাড়া হুল খেয়ে সে আরও ফুলেছে। হাঁফ ছাড়তে পারছিল না। তারপর আরও তালগোল পাকাল। তার গায়ে কি সব কিলবিল করা শুরু করল। হোঁদল ভাবল, নিশ্চয় সাপ। ছোবল দিয়ে নির্ঘাৎ বাপের নাম ভুলাবে। কিন্তু কুকুম্মা বলেছেন, দুপুরে আর সন্ধ্যায় সাপের নাম করতে নেই; বলতে হয় আস্তিক মুনি। হোঁদল তাই গলা ছেড়ে চেঁচাতে লাগল, "আস্তিক মুনি, আস্তিক মুনি।"

কিন্তু আস্তিক মুনি এল না,—এল ভজন ও ভোজন। এসে জিজ্ঞেস করল, "কি হয়েছে? তুমি কোথায় গো?"

হোঁদল বলল, "এই সিন্দুকের মধ্যে।"

ভোজন বলল, "সিন্দুকে কেন গা?"

"মৌমাছির তাড়ায়। গুঁয়োটেরা চলে গেছে, কিন্তু তার বদলে ঢুকেছে আস্তিক মুনি!"—হোঁদল কেঁদে জানাল।

"সাপ! সব্বোনাশ। ছোবল দেয় নি ত?"—ভজন আঁতকে উঠে প্রশ্ন করে।

হোঁদল বলে, "বোলতার হুলে সারা দেহ ফুলে আছে ত। ছোবল দেবার জায়গা পায় নি। তাই খুঁজে দেখছে।"

ভোজন বলল, "এই মরেছে! কি সাপ? গোখরা না কেউটে? ক' হাত?"

হোঁদল কেঁদে বলে, "ভয়ে চোখ বুজে আছি। মেপে দেখি নি।"

ভজন বলে, "মুস্কিল। ছোট হলে মারতে ছড়ি চাই, বড় হলে চাই শাবল।"

কেউ বলে, "হাঙ্গামা দরকার নেই। দাও সিন্দুক পুকুরে ফেলে।"

কেউ বলে, "দাও পুড়িয়ে। সাপ মরে যাক।"

হোঁদল ভয় খেয়ে চিৎকার করে বলে, "আমি সিন্দুকের ভেতরে রয়েছি যে।"

তখন তাদের খেয়াল হয়, বলে, "তাই ত! ডাক ওঝা।"

ক'জন ওঝার খোঁজে ছোটে। ঠাকুরমা খবর পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে আসেন; কাঁপা গলায় বলেন, "মা মনসা আর আস্তিক মুনি জপ কর দাদামণি। ছোবল দেয় নি ত? কি করছে?"

হোঁদল বলে, "কিলবিল করে খেলা করছে।"

"খেলা করছে,—অ্যাঁ!" ঠাকুরমা কলকলিয়ে উলুধ্বনি দেন,—উলু, উলু, উলু। দু'হাত কপালে জুড়ে বলেন, "অনিষ্ট করো না। বাস্তু সাপ, লক্ষ্মী সাপ। জয় মা মনসা। দুধ-কলা দেব। হোঁদলকে রক্ষা কর মা!"

তখন ভরসা করে ক'জন হোঁদলকে সিন্দুক থেকে টেনে হিঁচড়ে বার করে। তার পিছু পিছু সাপ বেরোয় না, বেয়োয় একপাল নেংটি ইঁদুর, আর তাদের বাপ, মা, ছেলে, মেয়ে, নাতি, নাতনী। সব নেংটো। সিন্দুকের ভেতর আবরু ছিল, বাইরে বে-আবরু হয়ে জিভ কামড়ে পালাল!

ভজন শাবল উঁচিয়ে বলল, "থাকত সাপ দেখে নিতেম।"

ভোজন বীরত্বপনা করল, "ইঁদুর বলে কিসৃস্যু বলি নি।"

ঠাকুরমা নিশ্চিন্ত হলেন; বললেন, "সিন্দুকে খাবার ছিল বুঝি? তাই মুটিয়ে গেছ দাদু!"

হোঁদল অনেক দুঃখে জানাল, "খাবার খেয়ে নয়, বোলতার হুল খেয়ে, কুকুম্মা! আমি কিচ্ছু করি নি। তাক করার জন্য মৌচাকে ঢিল মেরেছিলেম। বারণ করলেই হ'ত,—তা না করে চুটিয়ে কামড়!"



সে ভেউ ভেউ করে কাঁদে। ঠাকুরমা তার গায়ে হাত বুলিয়ে বলেন, "আহারে! দাদুকে কামড়,—ওদের বাড়ীঘর পুড়িয়ে দেব না? চ' ওষুধ দি,—খেতে দি।"

হোঁদল হাত বাড়ায়। কঁকিয়ে বলে, "চোখ ফুলিয়ে কানা করে দিলে! হাত ধরে নিয়ে চল কুকুম্মা।"

ঠাকুরমার চোখে ছানি। ভালো দেখতে পান না। হোঁদলকে নিয়ে চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে দু'জনে গড়াগড়ি যায়!

নয়

পণ্ডিত মশাইর টাকার, জিনিসপত্রের ও শরীরের যে ক্ষতি হয়েছিল ঠাকুরমা তা পুরণ করলেন। বিয়োগকে যোগ দিয়ে, ভাগকে পূরণ দিয়ে,—অঙ্ক তিনি মুখে মুখে করলেন, অর্থাৎ নিজের মুখে নয়, পণ্ডিতের মুখ দিয়ে করলেন।

দিগ্‌গজ পণ্ডিত তিনি,—মৌমাছির হুল গুণতে ভুল হ'ল না। মৌমাছির দশটি কামড়ের বাবদ একটাকা ধরে, ছেঁড়া টিকির এবং দাঁত বাঁধানর হিসাব করে, তিনি যোগফল বাড়ালেন। ঠাকুরমা রা করলেন না। সব উপচারে তাঁকে বশ করলেন।

তখন তিনি হৃষ্টমনে হোঁদলকে নতুন পাঠ দিলেন—'আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু—' অর্থাৎ কিনা সবাইকে দেখবে আপনার মত। শুধু আত্মীয় নয়,—সব কাজে আত্ম বলে সবাইকে দেখতে হবে।"

হোঁদল প্রশ্ন করল, "সর্ব্বভূত মানে কি পণ্ডিত মশাই? সব রকম ভূত?—শাকচুন্নি, মাম্‌দো, কন্দকাটা, বেহ্মদত্যি, আবাগার বেটা?"

"হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ! সর্ব্বভূত মানে ওসব নয়। সব রকম প্রাণী।"

"সাপ, বাঘ, ভালুক, জোঁক, কাকড়াবিছেও ত প্রাণী।"

"উঁহুঁ,—সে প্রাণী নয়। ওরা শ্লোক বোঝে না। যারা বোঝে—এমনতর প্রাণী। ধর তুমি, আমি। তুমি তোমার আর আমার ভেতর কোনও ফারাক করবে না। আমার

খুঁদকুড়া যেমন তোমার, তোমার টাকাপয়সা, ধনদৌলতও তেমন আমার। অর্থাৎ—”

আর বোঝাতে হ'ল না। হোঁদল মাথা নেড়ে বলল, “বুঝেছি।” আবার তার মগজের উনুনে জ্বাল পেয়ে তা দাঁড়াল এমনতর।

কিছুদিন আগে অমাবস্যার রাত্রে শ্যামাপূজা হয়েছে। হোঁদলের কল্যাণে ফের জাঁকজমকের পূজা। চকমকে সামিয়ানা, ঝকঝকে আলো। পণ্ডিত মশাই স্নান করে, পট্টবস্ত্র পরে, শ্লোক আউড়ে পুজো করেছেন। তারপর উৎসর্গ করে কাঠ-গড়ায় পাঁঠা বলি দিয়েছেন। মাথার উপর খাঁড়া তুলে বলেছেন, —“মাগো, নিও গো।”

ধারাল চকচকে মস্তবড় দায়ের ওঠা-নামা, সেই কোপে গোটা পাঁঠার কাটা মুণ্ড,—ধড়ের ধড়ফড়ানি, আর টকটকে লাল রক্ত-ধারার বহর অবাক চোখে দেখেছে হোঁদল। বলির আগে পণ্ডিত মশাই পাঁঠাকে আশীর্ব্বাদ করে বলেছেন, “এবার মানুষ হ।” দেখে তার ধারণা হয়েছে, এ ভাবে পাঁঠাকে মানুষ করার মস্ত সুযোগ! বেচারারা ঘাসপাতা খেয়ে কত কষ্টে দিন কাটায়। যখন সব প্রাণীকে নিজের মত করে দেখা উচিত, তখন এক কোপে তাদের পশুজন্ম ঘুচিয়ে, ঝোপঝাড় থেকে দালান-কোঠায় ওঠার সুযোগ দেওয়া আলবৎ দরকার।

এর ভেতর হোঁদল পাড়ার হাবাগোবা ছোট ছেলেদের সর্দ্দার হয়েছিল। এ বিষয়ে তাদের সঙ্গে আড়ালে দরবার হ'ল। এজন্য কি করা দরকার তাও স্থির হ'ল।...

পাঠ দিয়ে পণ্ডিত মশাই নিত্যকার মত পরিপাটি ঘুমিয়ে-

ছিলেন। হোঁদলের সাথীরা এ সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। স্কুল ছুটি। তারা গুটিগুটি এসে জানালার বাইরে ইশারা দেয়, "টু!"

হোঁদল জানালার ধারে গিয়ে জবাব দেয়, "হুঁ—টু।" ইংরাজী অঙ্কের টু নয়। যোগ করে, পূরণ করে 'ফোর' হয় না। তবু মন ফুর্ ফুর্ করে।

সে পণ্ডিত মশাইর ঘুমন্ত মুখের দিকে আড়চোখে চেয়ে, পা টিপে বাইরে যায়। এত বড় পুজো ও বলির জন্য কাজ বেঁটে দেয়। কেউ কর্ত্তা, কেউ হোতা, কেউ কর্ম্মী। হোঁদল নিজে পুরুত। উচ্ছোগ্‌গ করে বলি দেবে। কলিকালের পুণ্য কাজ। বন্দোবস্ত হয়ে আছে। একটা মোটা গাছের আড়ালে চাদর দিয়ে সামিয়ানা টানানো হয়েছে। রঙিন কাগজে আঠা জুড়ে তাতে আঁটতে ভুল হয় নি। তেত্রিশ কোটি দেবতা থেকে বেছে হোঁদল একটি কালীমুর্ত্তি এনেছে। ধামা করে এনেছে চাল, বাতাসা, ফল, ফুল, ধারাল দেখে একটি দা। কর্ম্মীরাও কিছু এনেছে। কাঠগড়া পুঁতেছে। খালি পাঁঠা, টিকি আর পৈতা জোটান হয় নি। হঠাৎ লগ্ন, তবু তাদের মন ভগ্ন হয় নি।

ব্রাহ্মণের মহল্লা নয়। কারুর টিকি-পৈতা নেই। কিন্তু হোঁদলের আজকের পাঠ মনে পড়ল—'আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু'। মোক্ষম কথা। পণ্ডিত মশাইকে আত্মবৎ দেখার বাধা নেই। তাঁর টিকি আছে, পৈতা আছে। খালি একটা কাঁচির ওয়াস্তা। তিনি নিটোল ঘুম লাগিয়েছেন। সোরগোল না তুলে, আলগোছে কেটে আনলেই হ'ল। তারপর পুজো আর বলি শেষ হলে তা জুড়ে দেওয়া। সাথীরা সায় দের। সবার মনে খুসীর হাওয়া বয়।

হোঁদল কুৎকুৎ

হোঁদল কাঁচি জুটিয়ে, পণ্ডিত মশাইর টিকি আর পৈতা ক্যাচ্ ক্যাচ্ করে কেটে আনে। সঙ্গীরা একত্র জুটে তাকে পরিয়ে দেয়। শক্ত গিট দিয়ে টেনে দেখে টিকি এঁটে আছে কিনা।

একটা ছেলে গাল ফুলিয়ে বিলিতি বাঁশীর শব্দ করে— ভেপ্পো ভেপ্পো ভো ভো। আর একজন একটা বালতির উল্টো পিঠ কাঠি দিয়ে বাজায়—ট্যাং ট্যাটাং ট্যাং ট্যাং।

যে কর্ত্তা সেজেছিল সে ভারিক্কি গলায় বলে, "পুরুত ঠাকুর, পুজোর লগ্ন দেখুন।"

হঠাৎ সবার খেয়াল হ'ল, আসল ঘরের মশাল নেই। পাঁঠা জোটান হয় নি। বলি ছাড়া পুজোর সবই খালি। এখন পাঁঠা কৈ ?

হোঁদল পুরুত সেজে পুজোয় বসেছিল। কুকুম্মার পাট-কাপড় আর নামাবলী জড়িয়ে সে অং বং মন্ত্র পড়ছিল। মূর্ত্তির গায়ে এলোপাথাড়ি ফুল-চন্দন দিচ্ছিল। সে পুজো ছেড়ে বলল, "তাই ত! পাঁঠা নেই, লেঠা ত!"

সে উঠে ইতিউতি তাকায়। তাদের বাগানে ঘাসপাতা খাবার টানে হামেশা গরু-ছাগল আসে। নির্ঘাৎ খুঁজে পাওয়া যাবে। এ জন্মে পুজোর বলি হলে পরজন্মে মানুষ হতে পারবে। তাদের কার কপালে এমন সুযোগ আছে কে জানে? খোঁজ, খোঁজ। সাথীগণসহ হোঁদল খুঁজতে বেরোয়।

কিন্তু পাঁঠাগুলো সত্যি পাঁঠা। ওরা অকাট-মুর্খ বলে হাঁদা মানুষদের পাঁঠা বলে গাল দেওয়া হয়। একটা পাঁঠাও সুযোগ নিতে এল না। অমন শুভলগ্ন ভগ্ন করল!

হোঁদল কুৎকুৎ

হঠাৎ হোঁদলের নজর পড়ল, একটা কুকুরের বাচ্চা ঘুর্‌ঘুর্‌ করছে। মোটাসোটা—সাচ্চা বংশের। হয়ত তাই ওর মানুষ হবার ইচ্ছা। আচ্ছা কথা! পাঁঠার বদলে কুকুর বলির কেচ্ছা সে ভুলে গেল। বলির জাত বিচার তুচ্ছ কথা।

আর মনে পড়ল পণ্ডিত মশাইর ফিকির-ফন্দী। পুজোয় বসে তিনি ঘিয়ের অভাবে তৈল, মধুর বদলে গুড় দিয়ে জোড়াতালি দেন। তা হলে পাঁঠার অভাবে কুকুর বলির লেঠা কিসের?

যাই ভাবা অমনি হোঁদল থপ্‌থপ্‌ করে এগিয়ে যেয়ে কুকুরটার কান ধরল।

কোলে না তুলে কান ধরায়, কুকুরটা 'কেঁউ কেঁউ' করে আপত্তি জানাল। মানের ভয়, কিন্তু এর পেছনে প্রাণের ভয় ওৎ পেতে আছে কি না সে কথা সে জানে না। তার আপত্তি দেখে অবশেষে তারা তাকে চ্যাংদোলা করে নিল।

বলির উপাদান জোটার আনন্দে ওদের কপাল কোটার উপক্রম হয়।

কর্ত্তা বললেন, "বলির সময় হয়েছে। বাজাও, বাজাও।"

বালতি, কেনেস্তার, কাঁসর, ভেঁপু—যা যা বাদ্যযন্ত্র ছিল, ওরা মহাবিক্রমে বাজাল। বলির আগে ধুম্বলি বাজনা!

হোঁদল আঁটঘাট হয়ে দা হাতে তৈরী। সঙ্গীরা কুকুরের গায়ে মাথায় জল ঢেলে পবিত্র করল। তারপর ঠেসে কড়িকাঠে পুরল। কিন্তু কুকুর-বাচ্চার ধর্ম্মজ্ঞান নেই।

তাদের পূর্ব্বপুরুষ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে স্বর্গে গিয়েছিল। সে কথা তাকে শুনিয়ে হোঁদল বলল, "সে পুণ্যে ধন্য হলি।"

তবু পাপী কুকুরটা কেঁউ-কেঁউ করে আপত্তি জানাল,—“কত্তা, পাতের আর আস্তকুঁড়ের খাবার চেটেপুটে সাবাড় করি। তাই আমাদের ধাত। তা ছেড়ে রথে চড়ে স্বর্গে যাবার পথ বাতলে লাভ নেই। হাত গুটোও,—পালিয়ে বাঁচি।”

হোঁদল তা শোনে না। “জয় মা কালী—হেইও” বলে দা উপরে তোলে। আর এক মিনিট। কিন্তু ষাট সেকেণ্ডে এক মিনিট, সে ফাঁকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লণ্ডভণ্ড হতে পারে। হঠাৎ কোত্থেকে একটা বদ্‌খৎ চেহারার প্রকাণ্ড কুকুর ঝড়ের মত ছুটে এল। তারই বাচ্চা খুঁজে না পেয়ে আচ্ছা রকম ক্ষেপে গেছে। এখন সবাইকে কামড়াবে—এমনি অকাল কুষ্মাণ্ড!

এমন বিপদের জন্য হোঁদল ও সাঙ্গপাঙ্গরা তৈরী ছিল না। তারা বুঝল, কুকুরটা রঙ্গ করতে আসে নি। পুজো ভঙ্গ ত করবেই, তা ছাড়া রক্তগঙ্গা বহাবে। সত্যি কুকুরটা তেমনি ভঙ্গীতে হোঁদলকে আক্রমণ করল, আর সে “ওরে বাবারে, মলামরে, গেলামরে” বলে দিল ছুট। তার পেছনে ছুটল সাঙ্গপাঙ্গরা গোল্লাছুট খেলার সাঙ্গাতের মত। কিন্তু হোঁদলের হোঁৎকা শরীর। সে পড়ল সবার পেছনে। ভাগ্যিস দাটা সে হাতছাড়া করে নি। তা ছাড়া কুকুরটা আগে তার বাচ্চা সামলাল; তারপর ঝাড়া হাতপায়ে তাকে তাড়া করে ঘরের দোর অবধি পৌঁছে দিল।

হোঁদল দোর বন্ধ করে হাপরের মত হাঁপাতে লাগল। একটানা ঘুম দিয়ে খানিক আগে পণ্ডিত মশাই জেগেছিলেন। জেগে উঠে প্রথমেই টিকি ও পৈতা হাতড়ে দেখা তাঁর রীতি। কিন্তু আজ দেখলেন, একটিও নেই। বাদলা দিন নয়, তবু

হাওয়া হয়ে গেছে! যে এই দুষ্কার্য্য করেছে তাকে ব্রহ্মশাপ দেওয়া দরকার। কিন্তু গলায় পৈতা নেই যে তা মন্ত্রপূত করবেন!

এমন সময় খাঁড়া হাতে তাঁর ছাত্র যমদূতের মত এসে দাঁড়াল। তার মাথায় টিকি, গলায় পৈতা। কিন্তু ঘণ্টাখানেক আগেও তা ছিল না! এত অল্প সময়ে কি করে গজাল! তিনি সব বুঝলেন। একটা হেস্তনেস্ত করতেন; কিন্তু তার হাতে খাঁড়া দেখে গেলেন ভড়্কে।

শাস্ত্রে, পুঁথি-পুরাণে তিনি খাঁড়াধারী ছাত্রের কথা পড়েন নি। এতদিনের অভিজ্ঞতায় দেখেনও নি। খাঁড়া দিয়ে কলম-পেন্সিল কেটে গোটা গোটা হাতের লেখা চলে না,—চলে বলি। কিন্তু মাষ্টারকে পাঁঠা বলে ভুল করার কথা ত নয়। এ বয়সে ছাত্রের চোখে চাল্‌শে ধরেছে নাকি?

হোঁদল ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। গলে-যাওয়া গলায় বলল, "পূজো আর বলি ছিল মাষ্টার মশাই। কিন্তু টিকি আর পৈতা ছিল না। সব যখন আত্মবৎ, না বলে নিয়েছি। আমার আর চাই না, নিন।"

সে টিকি আর পৈতা ফিরিয়ে দেয়।

পণ্ডিত মশাই চটে টং হয়েছিলেন; কিন্তু তাঁর মনে হ'ল, লোভের মত ক্রোধেও পাপ আর মৃত্যু হয়। অপমৃত্যু হওয়াও বিচিত্র নয়। ভাবলেন, বরং টিকি ও পৈতা গেলে ফের পাওয়া যায়, কিন্তু পৈতৃক প্রাণ গেলে আর মেলে না! কাজেই দুর্জ্জন-সঙ্গ বর্জ্জন শান্তি অর্জ্জনের সেরা পথ। তিনি তর্জ্জন না করে সে পথ ধরার জন্য দোর খুলে বেরুলেন। কিন্তু

আজ কার মুখ দেখে যে উঠেছিলেন! মনে পড়ল, এক শিষ্য বিনি পয়সায় নড়া দাঁত বাঁধিয়ে দিয়েছিল। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে খুসী হয়ে তিনি আরসীতে তা দেখেছেন। দাঁত দেখতে গিয়ে মুখও দেখেছেন—নিজের মুখ। তবু দুঃখ পেলেন!

রোদবৃষ্টি থেকে বাঁচাতে আর এক শিষ্য দিয়েছিল ছাতা। তিনি তা মেললেন। হঠাৎ একটা কুকুর বেয়াড়া ঘেউ ঘেউ শব্দ করে তেড়ে এল। এটা সেই কুকুর যার বাচ্চাকে হোঁদল বলি দিতে উদ্যত হয়েছিল। হোঁদলের ওপর তার রাগ পড়ে নি। তাকে বাগে পাবার জন্য সে ঘাঁটি আগলে ছিল।

ছাতা দিয়ে মুখ ঢাকা মাষ্টারকে হোঁদল বলে ভুল করে সে টুটি ধরতে এল। আর মাষ্টার ভয় পেয়ে দিলেন ছুট। তারপর হোঁচট খেয়ে লুটোপুটি। ছাতা গেল খসে। ছাত্রের ওপর কুকুরটা চটেছিল, মাষ্টারের ওপর নয়। এবার ভুল বুঝে সে হটে গেল। জিভ কাটল কিনা পণ্ডিত মশাই খোঁজ নিলেন না। কিন্তু বাঘা কুকুরটা বাঘের মত হিংস্র। তাই পণ্ডিত মশাই সেই যে গেলেন, আর ফিরলেন না।

দশ

আর মাষ্টার খোঁজা হ'ল না। হোঁদল বায়না ধরল, এবার স্কুলে পড়বে। ঘরের মাষ্টারে আর চলবে না। সে বড় হয়েছে। ঘরের গাড়ী আছে—ঘোড়ার গাড়ী। যাতায়াতে কষ্ট নেই। লোকজন টিফিন নিয়ে যাবে। হোঁদল বলে,

"কুকুম্মা খুব ভালো ভালো খাবার পাঠাবে,—হুঁ। ইস্কুলের মেহনত সোজা নয়, খাজা-গজা, ক্ষীরভাজা, মিহিদানা খেয়ে তাজা হ'ব।"

ঠাকুরমা ভরসা দেন। ছেলেকে বলেন, "এমন ইস্কুলে দাও যেখানে গাল-মন্দ, মার-ধোর নেই। ওর ননীর শরীলে সইবে না।"

বাপের অত বাছাবাছির সময় নেই। কাছাকাছি এক স্কুলে ভর্ত্তি করে দিলেন। হোঁদলের ফুর্ত্তি ধরে না। কিন্তু ভর্ত্তি হবার পর তার আকার-প্রকার দেখে, কাতারে-কাতারে ছেলের ভিড় হ'ল। সারা স্কুলে এর জুড়ি নেই! চিড়িয়াখানা থেকে এক কিম্ভূতকিমাকার জানোয়ার বেরিয়ে এসেছে যেন। তখন বাংলার ক্লাস। বুড়ো মাষ্টার চোখে কম দেখেন। সেই সুযোগে হ্যাংলা ছেলেরা হৈ-হল্লা করে। তিনি আপন মনে পড়ান, ভালো ছেলেরা মন দিয়ে শোনে বলে আনন্দ পান। আনন্দে মাঝে মাঝে ঝিমোন। ভালোরা প্রথম সারিতে বসে, দুষ্টুরা পেছনে। তারা নিজেরাই এই ভাগ করে নিয়েছে।

দুষ্টুরা হোঁদলকে তাদের দলে ডেকে নিল। দল ভারী করার মতলবে নয়,—তাকে নাজেহাল করার জন্য। নূতন ছেলে ক্লাসে এলে শুরুতে তারা এ রকম করে, পরে সুবিধা না হলে হাল ছেড়ে দেয়।

হোঁদল এসব জানে না, সরল মনে বসল। তখন দুষ্টু ছেলেরা নানান প্রশ্ন করে, আর হোঁদল তার উত্তর দিতে হাবুডুবু খায়। দলের সর্দ্দার প্রতাপ প্রশ্ন করে, "পেটে বালিশ বেঁধেছ কেন গো? ঠেস দেবার জন্য?"

"না ত!" হোঁদল জামা তুলে দেখায়। আর আঙ্গুলে থুথু মাখিয়ে প্রতাপ তার পেটে ঘসে দেখে, কালি ভরে কি না।

"অত বড় ভুঁড়ি বাগিয়েছ! কি খাও?" নরেন প্রশ্ন করে।

"ভাত, ডাল, মাছ, মাংস, দুধ—যেদিন যেমন।"

"আর কলা-মুলো, কচু-ঘেচু, ছাতু-ছোলা?"

"তাও খাই।"

"কোথায় থাক? গাছে না ডোবায়?"—প্রতাপ জিজ্ঞেস করে।

"বাড়ীতে।"

"তোমার বয়স কত?"

"কুকুম্মা জানেন।"

"সে আবার কে?"

"আমার ঠাকুমা।"

"নিজের বয়স জান না! নাম জান?"

"হাঁ জানি,—হোঁদলরাম।"

"কি, কি বললে? হোঁদল কুৎকুৎ! হুবহু তেম্নি চেহারা। দেখ দেখ নরেন।"—বলে প্রতাপ তার মুখ জোর করে তুলে ধরে।

জোরাজুরিতে মুখে আঁচড় লাগে। তখন চটেমটে হোঁদল প্রতাপের হাত ধরে এমন টিপি দেয় যে সে 'উঃ উঃ' করে সরে যায়। তখন নরেন এগিয়ে এসে বলে, "গায়ে হাত তোলার আস্পদ্দা! অ্যায়সা গাট্টা মারব—"

তাকে সামনে পেয়ে হোঁদল আঁচড়ে দেয়, আর নরেন চেঁচিয়ে ওঠে—"দিলে আঁচড়ে। কী লঙ্কাপোড়া!"

"যেমি চেহারা তেমি বাহার! হনুমান কলা খাবি?" বলে প্রতাপ বুড়ো আঙ্গুল হোঁদলের সামনে ধরল। আর সে খা করে তা ধরে দিল মুচড়ে।

প্রতাপ চেঁচিয়ে উঠল, "উঃ হোঁদল কুৎকুৎটা মারধোর শুরু করেছে। আয় ওকে সায়েস্তা করি।"



প্রতাপের ক'জন সঙ্গী এগিয়ে এল। তখন হোঁদলের সঙ্গে তাদের লাগল পেটাপেটি।

দমাদ্দম চড়-চাপড়, কীল-ঘুসি; কিন্তু হোঁদল যার নাগাল পায়, তাকে বগলতলায়, হাঁটুর ফাঁকে চেপে নাম ভুলিয়ে দেয়। এক সময় সে প্রতাপের কানে এমন খামচি দেয় যে সেখানে কেটে রক্ত বেরোয়।

প্রতাপ রুমালে কান চেপে দূর থেকে হোঁদলকে জব্দ করার ফিকির খোঁজে।

হাতে পাল্লা দিতে না পেরে, ওরা মুখে তুবড়ির জেল্লা ছোটায়।

প্রতাপ মুখে মুখে চোস্ত ছড়া বানায়, আর সবাই দূর থেকে হাততালি দিয়ে, সুর করে আওড়ায়—

"হোঁদল কুৎকুৎ ফোঁসমনসা,
তিনটি বিকায় আধপয়সা।
আস্ত গাড়োল, জংলী খাস,
কুড়িয়ে খায় পচা ঘাস।
ওরে হোঁদল, ফিরে চা,—
কচুপোড়া খেয়ে যা।—"

কেউ কেউ বাঁ হাতের চেটোয় ডান হাতের কনুই রেখে বক দেখায়। হোঁদল জ্বলে উঠে। সে দপদপান আগুনে ওদের জ্বালিয়ে দিতে চায়। মুখ খিঁচিয়ে বলে, "কাছে আয় না, কেমন মুরোদ। বক দেখিয়ে দি।"

"ডরাই নাকি ?" বলে প্রতাপ একপা এগোয়, আর হোঁদল দেয় তাড়া। ওরা দেয় ছুট। দূরে গিয়ে বলে, "চিড়িয়াখানা থেকে গরীলা বেরিয়েছে রে।"

চিৎকার শুনে বাংলার মাষ্টারের ঘুম ভেঙ্গে যায়। তিনি ধমক দিয়ে বলেন, "কিসের ধুমধাড়াক্কা লাগিয়েছ ?"

হোঁদল রাগে হাঁফাচ্ছিল। সব বলতে পারে না। বিপক্ষ অনেক কথা বানিয়ে বলে। মাষ্টার মশাই সত্য-মিথ্যা অনুমান করে হোঁদলকে ডেকে সামনের বেঞ্চিতে বসান।

সেদিন বিকেলে বাড়ীর গাড়ী বাপের জন্য আটক থাকে। কি কারণে ভজন বা ভোজনও আসতে পারে নি। হোঁদল

একা একা চলল। কিন্তু পথে প্রতাপের দল তাকে ছেঁকে ধরল। তারা প্রতাপের বানানো ছড়া হাততালি দিয়ে জোরে জোরে বলল—

"যেম্নি ছুরত, তেম্নি গুণ,
কামড়ে দিলে মানুষ খুন।
যাসনে কাছে নির্ভরসা,
হোঁদল কুৎকুৎ ফোঁসমনসা।
ওরে হোঁদল নেচে যা,
কাঁচাকলা যেচে খা—।"

হোঁদল তাড়া দিতে ওরা পালায়, আবার কাছে ঘনায়। বহুক্ষণ এমন উপদ্রব করে ওরা রেহাই দিল।

হোঁদল বাড়ী ফিরে ঠাকুরমাকে সব জানিয়ে বলল, "আর ইস্কুলে যাব না। দুষ্টু ছেলেগুলো খামোকা ক্ষেপায়। গাড়োল বলে, কচুপোড়া খেতে বলে, হোঁদল কুৎকুৎ বলে।"

ঠাকুরমা তার গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে বলেন, "তুমি তা হতে যাবে কেন দাদু? মুখপোড়ারা তা হোক, তা থাক। তোমার জন্য কত মণ্ডা-মেঠাই আছে, তা খাবে। ওদের ধরে কচুপোড়া খাওয়াব। তোমার বাবার আলকাতরার কারবার আছে। সে খবর ওরা জানে না ত। দেব আলকাতরাভরা পিপেগুলো ওদের গায়ে ঢেলে।"

এ কথা এতক্ষণ হোঁদলের মাথায় আসে নি। সে দাঁত বার করে বলে, "জবর কথা মনে করেছ কুকুম্মা। কাল এক কৌটো আলকাতরা লুকিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। ওদের আর সাঙ্গপাঙ্গদের মাথায় ঢেলে দিয়ে রঙ্গ বার করব।"

সত্যি সে তা নিয়ে যায়, এবং গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধিয়ে ওদের গায়ে মাথায় ঢেলে দেয়। ওদের হোঁদলের চেয়েও কিম্ভূত-কিমাকার দেখায়!

তারা হেডমাষ্টার মশায়ের কাছে গিয়ে তার বিরুদ্ধে নালিশ করে। সবশুদ্ধ তাদের সংখ্যা ঢের বেশী। তারা শঙ্খ বাজিয়ে চলে, আর একলা একেশ্বর হোঁদল নিজের ঘণ্টা বাজাতে পারে না। সে দোষী বনে যায়। তার সাজা কেমনতর তার জানা ছিল না। তাকে গাধার টুপী মাথায় সারাক্ষণ বেঞ্চিতে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। সবার টিটকারি পেয়ে, তার চোখ ফেটে জল আসে।

বাড়ী ফিরে সে কুকুম্মাকে সব কথা বলে হাউ-হাউ করে কাঁদে। তিনি দোষ-গুণ বিচার করেন না। ছাত্রদের ও হেডমাষ্টারকে গালমন্দ করে বলেন, "সোনার জাদু হোঁদলকে সাজা দেওয়া! ওদের মুয়ে মুড়ো খ্যাংড়া। ছাই স্কুলে তোমাকে আর পাঠাব না দাদু।"

ঠাকুরমা হোঁদলের স্কুলে যাওয়া খতম করে দেন।

তখন মায়ের সুপারিশে ভ্যাবলরাম তাকে কারবারের তালিম দেন। কিন্তু অল্পদিনেই টের পান. শানপালিশে এ ছেলে চকচকে হবার নয়। সে মরচে-ধরা বাজে লোহা, এক ছিটে ইস্পাত তাতে নেই।

ঘেমে আলকাতরা বাড়ান দূরে থাক, তার ছোঁয়ায় তা উবে যায়। এম্নি আঁক সে শিখেছে যে, জাঁক করে গাহেককে বেশী মাল দিয়ে কম দাম নেয়। যে পাঁচমণ আলকাতরা নিতে আসে তাকে দেয় সাতমণ, যার কাছে সাত টাকা পাঁচ আনা

পাওনা তার থেকে নেয় পাঁচ টাকা সাত আনা। হিসাবে একটুকু আটকায় না। কিন্তু বাবাকে বোঝাতে না পেরে তার চোখ পিট-পিট করে।

বাপ দুঃখ করে বলেন, "এত খরচপত্তর করে মাষ্টার-পণ্ডিত রেখে, কি শেখালেম ?"

হোঁদল চটপট উত্তর দেয়, "পৃথিবী দিনরাত চর্কীর মত ঘোরে,—সে সঙ্গে মাথা। মানুষ, গরু, ছাগল সবার স্ত্রীই মা,—আমাদের সব জিনিস পরের, পথের ভিখারিও তোমাতে তফাৎ নেই।"

সবেধন নীলমণি ঐ ছেলে। তাকে ঠেলে ফেলা যায় না। বাপ আর কি করেন ? যা পারেন নিজেই দেখেন শোনেন। হোঁদলের তাতে চেতনা নেই।

বাপ তার মগজের ওজন বোঝেন। কবিরাজ দেখান। ওষুধের চূর্ণ, বড়ি, অরিষ্ট ও ঘৃতের ব্যবস্থা করেন। খেয়ে হোঁদল গায়ে-পায়েই দরাজ হয়, মগজের দরজা খোলে না !

ঠাকুরমা তা দেখতে পান না। তার গা ও গোদা পা দেখে আনন্দে গদ্‌গদ হন।

এগার

ভোঁতা মগজ ধারাবার গরজ হোঁদলের ছিল না। সে ভাবে, কুকুম্মা, হাম্বা ও আব্বা চিরকাল বেঁচে থাকবে। আর তাদের কাঁধে ভর করে সে খাজাগজা, নারকেলের নাড়ু, সন্দেশ, পোলাউ, মাংস মজা করে খাবে। হিসাব করে না, কুড়েমী ও আলসেমীর ফলে একদিন দারুণ দুর্দ্দিন আসবে।

সে হিসাব না করুক, তার হাঁদা বুদ্ধি, কুড়েমী ও মূর্খামীর সাজা ভুগতে হ'ল। পরিশ্রম করে গাছ না পুঁতেও সে মিষ্টি ফলের ভরসায় ছিল। তা ভেঙ্গে গেল।

অনেক খেটে তার বাপের শরীর ভেঙ্গে গিয়েছিল। তিনি হঠাৎ গেলেন মরে। হুড়মুড় করে বোঝা এসে পড়ল হোঁদলের মাথায়।

তারপর বোঝার উপর শাকের আঁটির মত মা ও ঠাকুরমা মরে গিয়ে তাকে হাবুডুবু খাওয়াল।

বাপের কাছে ব্যবসা শেখার আগ্রহ সে করে নি। গায়ে ফুঁ দিয়ে হেসে খেলে বেড়িয়েছে। তাই নানা দিক দিয়ে এবার নিগ্রহ শুরু হ'ল।

অনেক ফন্দী-ফিকিরবাজ লোক তার হাঁদা মগজের সুযোগ নিজের কাজে লাগাল। তার ফলে আলকাতরার পিপেগুলো শূন্যে মিলিয়ে গেল।

'মাতৃবৎ পরদারেবু,--পরদ্রব্যেযু লোষ্ট্রবৎ,—আত্মবৎ সর্ব্ব-ভূতেষু'—এ সব চকমকে কথা কয়ে, কত লোক তাকে ঠকাল। ঠোকাঠুকি খেয়ে তার কারবার ফেল পড়ল। বাড়ীঘর, ধন-দৌলত উবে গেল। সে তখন বন্ধুদের কাছে হাত পাতল। তারা মুখ শুকিয়ে বলল, "নিজেরাই খেতে পাই না, ভাই।"—সুসময়ে এরা ঘিরে থাকত, দুঃসময়ে সরে গেল। গাছের ঠাণ্ডা ছায়া থেকে তাকে মরুভূমির মায়া-মরীচিকায় বসিয়ে গেল!

পাওনাদাররা তার বসতবাড়ী অবধি নীলাম করে নিল। বাড়ীর বাইরে এসে ক'দিন সে হাউ-হাউ করে কাঁদল; কিন্তু

তাতেও কেউ তাকে দয়া করল না। নানা কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার মনে কুকুম্মার মুখে শোনা সওদাগরপুত্রের বাণিজ্য-যাত্রার রূপকথা জেগে উঠল। ময়ূরপঙ্খী নায়ে পাল তুলে, সওদাগরপুত্র সাত সমুদ্র ডিঙিয়ে বাণিজ্যে বেরিয়েছিল ; কুড়িয়ে এনেছিল অনেক ধনদৌলত।

কে হোঁদলকে বলল, বাণিজ্যের জন্য বোম্বের তুলনা নেই। যাই শোনা, সেখানে যেতে সে ক্ষেপে গেল। জিনিসপত্র যা নীলাম হতে বাকি ছিল, তা বেচে সে শ' দুয়েক টাকা জোটাল। তারপর একটা টিনের স্যুটকেসে টুকিটাকি জিনিসপত্র নিয়ে, ট্রেণের থার্ড ক্লাসে চেপে বাণিজ্যযাত্রায় বেরুল। কিন্তু সে ঘুম-কাতুরে লোক। ট্রেণের ঢুলুনীতে বেঞ্চিতে বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়ল। হঠাৎ মাথায় শক্ত ঢুঁ খেয়ে ঘুম ভেঙ্গে ফেউ করে উঠল। শুধু তাই নয়, দেখল তার টিনের স্যুটকেস ও পকেটের টাকাপয়সা—মায় টিকিটও নেই! খালি চুরি নয়, পকেটমারিও! তখন তার দাঁতকপাটি লাগল। বাণিজ্যে বেরুবার মুখেই কুপোকাৎ। পাঁজিতে দিনক্ষণ দেখে বেরোয় নি, তাই যত রাজ্যের পাজি-ছুঁচোর কারসাজিতে পড়ল!

দুর্দ্দান্ত দৈত্য শুম্ভ-নিশুম্ভের গল্প সে কুকুম্মার মুখে শুনেছিল। বোম্বে মেলের চালচলন তার চেয়ে ফেলা যায় না। ভয়ে চোর-জোচ্চোর-খুনী-হারমাদেরও কুঁকড়ে থাকার কথা। তার মালপত্র নিয়ে তারা নিশ্চয়ই আর লাফিয়ে পড়ে নি। কোথাও চুপটি করে ঘুপটি মেরে আছে।

সে উঠে তদারক করতে লাগল। যাত্রীদের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়,—টেরা চোখে চেয়ে দেখে, তাদের চোখে মুখে চোর-

জোচ্চোরের ছাপ আছে কিনা। তাদের টিনের বাক্স নিয়ে টানাটানি করে গাল-মন্দ-বকুনী খায়। তারপর নিঃসম্বল লোকের শেষ সম্বল—মাথায় হাত দিয়ে হাউ-হাউ করে কাঁদে।

যাত্রীদের কেউ তাকে আরও ভড়কে বলে, "কেঁদে কি হবে? চেকার বলবে, ছাঁদা কথা নয়,—ডবল মাশুল দাও, নয় ত উশুলের জন্য পুলিশের ঝোলায়—"

"অ্যাঁ—পুলিশ!" হোঁদল তড়পায়। পুলিশকে সে বিষম ভয় পায়। এড়াবার জন্য পরের ষ্টেশনে গাড়ী ভিড়তে, সে তড়াক্ করে লাফিয়ে নামে। বিরাশি-সিক্কার আছাড় খেয়ে তার হিক্কা ওঠে। ষ্টেশনের অফিস-ঘরে পুলিশ ওৎ পেতে আছে কি না কে জানে? দূরে রেললাইনের অপর পিঠে আলো নেই। দূরে শেয়ালের হুক্কা-হুয়া ডাক আছে। ক্যাক্ করে ধরার নয়,—হয়ত হুঁকো খাবার ডাক! গাড়ীর আড়ালে আড়ালে সে সেদিকে পা চালাল।

ঠাকুরমার আদুরে ঘুম-কাতুরে মানুষ—কুম্ভকর্ণের অষ্টম সংস্করণ! চোখ ঢুলে আসে, গা এলিয়ে মজা করে মৌজ করার জন্য সে শয্যা খোঁজে।

আজ ভজন আর ভোজন নেই যে বিছানা পেতে দেবে। কি আর করা,—সে অন্ধকারে হাতড়ে একটা শক্ত উচ্চ জায়গায় শুয়ে পড়ে। তারপর আরামের ঘুম,—আর রঙ-চঙা স্বপ্নের ধুম!—নিঝুম রাতে খোঁচা খেয়ে তা ভাঙ্গল। চাঁছা-ছোলা খোঁচা। শুধু তাই নয়, একেবারে ছুঁচোর কীর্ত্তন। সে চোখ চেয়ে দেখল, কালো-পোষাক-পরা একটা খালাসী প্রকাণ্ড খন্তা দিয়ে তাকে একরাশ কয়লার ভেতর থেকে টানছে!

হোঁদল কুৎকুৎ

এ কি রে বাবা,—একেবারে প্রাণ নিয়ে টানাটানি! ঝিক্-ঝিক্ হুস্‌হাস শব্দ, বয়লারে ঝক্‌ঝকে আগুন, নানান কলকব্জা। দেখে তাজ্জব লাগে।

সে চোখ রগড়ে দেখে। শুধু রগড়ে কাণ্ড নয়,—একেবারে ভূতুড়ে! এঞ্জিনের লাগোয়া কয়লাগাড়ী,—সেই কয়লার স্তূপে সে এতক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে ঘুমিয়েছিল! আর এঞ্জিন চলেছে ভীষণ বেগে। কি জানি যদি রেগেমেগে ফেলে দিত! তাতে কি হ'ত তা চিন্তা করে, সে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল, "ওরে বাপরে, গড়িয়ে পড়লে গুঁড়িয়ে যাব।"

এঞ্জিনের শব্দ ছাপিয়ে জোর চিৎকার চালকের কানে পৌঁছাল কিন্তু চেয়ে চেয়ে কয়লার স্তূপে সে তাকে দেখতে পেল না। অন্ধকার রাত্রে কয়লার সঙ্গে তার গায়ের রং মিশে গিয়েছিল।

তবু এঞ্জিন-চালক অবাক হয়ে বলল, "কোথা থেকে চেঁচাচ্ছ গো?"

হোঁদল বলল, "এই যে আমি।"

"তুমি! তুমি কে? ওঁখানে ত বিলকুল কয়লা।"

"আমি কয়লা নই,—মানুষ!" হোঁদল বুদ্ধি খাটিয়ে মাথা নাড়ে।

বয়লারের আঁচে এবার চালক টের পায় সে সত্যি মানুষ! তাকে নামিয়ে দেখে, কয়লায় মাখামাখি হয়ে তার চেহারা কিম্ভূতকিমাকার হয়েছে। তাকে বলে, "সাংঘাতিক! ওখানে গেলে কি করে? ভারি চালাক ত তুমি, কয়লা চুরির মতলব ছিল?"

ফ্যাসাদের কথা শুনে হোঁদল ভয় খেয়ে ফ্যা-ফ্যা করে বলে, "উহুঁ। বড্ড ঘুম পেয়েছিল কিনা। অন্ধকারে দেখতে না পেয়ে, বোধ করি কয়লার থুপে ঘুমিয়েছিলেম।"

"আর ভুল করে কয়লার সাথে কুলীরা এঞ্জিনের লেজে তুলে দিয়েছিল। ভেবেছিল রাণীগঞ্জের মাল,—সঙ্গে রাজাও এসেছে!" বলে এঞ্জিন-চালকের সে কি হাসি! হাসি আর থামে না, নানা রকমের হাসি—হা-হা হি-হি হু-হু হো-হো!

হোঁদল বলে, "আমি বেটাছেলে। রাণীগঞ্জের মাল হতে যাব কেন?"

"কয়লার মধ্যেও বেটাছেলে মেয়েছেলে আছে নাকি? তা হলে তাদেরও মানুষ হতে বাকি নেই।"

চেহারা নিয়ে ঠাট্টায় হোঁদল ভারি চটে। বলে, "কয়লা ঘেঁটেই ত খাচ্ছ, তা নিয়ে যাচ্ছে-তাই ঠাট্টা কিসের? আমারও আলকাতরার কারবার ছিল। তা নিয়ে ঠাট্টা-মস্কারি করি নি কখনও।"

"চেহারা দেখেই মালুম হয়েছে। টিকেট আছে সঙ্গে?"

ফের ফ্যাসাদের কথা! তা বরবাদ করার জন্য হোঁদল উল্টো চাপ দিয়ে বলল, "যাব কোথায়, আর নিয়ে এলে কোথায়? তাও কয়লায় চাপিয়ে!"

এঞ্জিন-চালক হেসে বলে, "বেজায় অন্যায়। বল ত ফিরিয়ে দিঁ। তবে এটা মালগাড়ী। বোম্বে যাচ্ছে। কাছাকাছি এসে পড়েছ যখন, বোম্বে সহরটা একবার দেখে যাও, নিজকেও দেখিয়ে যাও।"

হোঁদল ঠেস দিয়ে বলে, "ভারি বুদ্ধি বাতলালে! ঐ

মতলব নিয়েই ত বেরিয়েছিলাম। কিন্তু চোর আমার স্যুটকেস, মনি-বেগ, মায় টিকেট সব মেরে দিয়েছে। তাই ত পথে নেমে পড়ি।"

"কিন্তু ক্ষতি পুষিয়ে নিয়েছ। রেলগাড়ীর মাথা হ'ল এঞ্জিন। তা চড়ে যেতে রাজারাজড়াও পারে না। কয়লা নাড়াচাড়া করি বলে আমি না হয় রেহাই দিলেম। কিন্তু ষ্টেশনে নামতে চেকার ছাড়বে না।"

শুনে হোঁদল ভড়কে যায়।

মালগাড়ী বোম্বের প্লাটফর্মে থামতে হোঁদল টুপ্ করে উল্টো পিঠে নামে, তারপর থপ্থপ্ করে হাঁটে।

এঞ্জিন-চালক খুক্খুক্ করে হাসে। রাগে হোঁদল ফিরে তাকায় না। বিদেশ-বিভুঁই না হলে একহাত দেখিয়ে দিত। সে মনে মনে জামার আস্তিন গুটায়।

চেকারকে এড়িয়ে সে গুটিগুটি হাঁটে। এখন হয়েছে কি, একদিন আগে বড় এক সার্কাস পার্টির অনেক মালপত্র এসে পেঁৗছেছে ষ্টেশনে। মাল খালাসের জন্য সার্কাসের লোকের আনাগোনা। হোঁদল পড়ত পড় সেখানে। চালচলনে, রংএ ঢংএ তাকে ক্লাউন (ভাঁড়) বলে মনে হ'ল। তাই রেলের লোক কিছু বলল না।

তখন টেরা চোখে ইতি-উতি চেয়ে, হোঁদল হেঁটে চলল। পূব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ কোন দিকে—তা সে জানে না। না জানুক, ক্ষতি নেই। যেদিকে চেকার নেই সেদিকে যেতে পারলেই রক্ষা। এ ভাবে হেঁটে সত্যি সে রক্ষা পেল।

লিকলিকে মাষ্টারের মত নাকের নিঃশ্বাস মেপে সে পা

বাড়ায় নি। চলতি এঞ্জিনের খোলতাই হাওয়ায় তার এন্তার সর্দ্দি জমে নাকের একটি ছেঁদা বুজে গিয়েছিল। হয়ত অজানতে অপর ছেঁদার নিঃশ্বাসের সাথে তার পথচলা হাত মিলিয়েছিল। তার ফল সে সোজাসুজি পেল—খোঁজাখুঁজি করতে হ'ল না। রুমাল দিয়ে গায়ের কয়লা ঝাড়া-মোছার জন্য সে প্যাণ্টের পকেটে হঠাৎ হাত দিয়ে দেখল, সেখানে রেলের টিকিট ও কতক টাকাপয়সা মাথা গুঁজে আছে! টিনের স্যুটকেস খোয়া যেতে, মাথা গুলিয়ে সে প্যাণ্টের পকেট খোঁজে নি। কোট আর সার্টের পকেটে বার বার খুঁজেছে!

বাইরে বেরিয়ে রুমাল দিয়ে ঝেড়েঝুড়ে সে কয়লার গুঁড়ো খানিক ছাড়াল। ক্ষুধা পেয়েছিল, একটা সস্তার হোটেলে ঢুকে পেট ভরে খেল। তারপর ভুঁড়ি বাগিয়ে ঘুরে ঘুরে বোম্বে সহর দেখতে বেরুল।

বার

বোম্বে এসে শুরুতে সুবিধা হ'ল না বরং প্রতিপদে অসুবিধার একশা। রাস্তায় বেরুলে মোটর, বাস, লরিগুলো কিলবিল করে আসে। চাপা দেবার জন্য যেন কীলঘুসি বাগিয়ে আসে। আর গোঁৎ মেরে বাঁচার চেষ্টায় ছুটতে গিয়ে সে হোঁচট খেয়ে লুটোপুটি।

স্নান করতে, খেতে, শুতে পয়সার ধাক্কা। ক'দিনে পকেট ফাঁকা গড়ের মাঠ! তখন ফুটপাথে ভোজন ও শয়ন। তাঁবেদার ভোজন ও ভজনের কথা মনে করে কান্না পায়। মণ্ডা-মেঠাইর

বদলে ছাতু-ছোলা খেয়ে বাপের নাম ভোলার উপক্রম হয়। সে যেন বোম্বেটের দেশে এসেছে, তাই নাম বোম্বাই।

সে ভেবে চিন্তে স্থির করে বরং কয়লার গাড়ী চেপে ফিরে যাবে। কয়লার গুদামের কাছে আনাগোনা করে; কিন্তু পাহারাওয়ালার বাধায় ফেরা হয় না।

অবশেষে মনের দুঃখে, গুমরো মুখে সে ঘুরে বেড়ায়। সার্কাসের তাঁবু তখন টানান হয়েছে। খেলা দেখতে লোকের ভিড়। তারা দিনের বেলা পয়সা দিয়ে নানা জানোয়ার দেখে, আর রাত্রে টিকিট কেটে দেখে তাদের খেলা। একদিন হোঁদল জানোয়ার দেখতে গেল। কিন্তু সে দেখবে কি, সবাই তাকে দেখে! সে হাঁটলে তারা পিছু হাঁটে, দাঁড়ালে দাঁড়ায়। শুধু তাই নয়, তারা তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে, অথচ সে সার্কাসের খুঁটি নয়।

তার অবাক লাগে। বোম্বাই আমের এত নাম, কিন্তু সেখানকার মানুষ কি মোটা লোক চর্ম্মচোখে দেখে নি? মোটা হওয়া ত মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়। চুটিয়ে আম খেলেই হওয়া যায়। ওরা কি খালি হাওয়া খায়? তারা তাকে ছেঁকে ধরায়, চিনে জোঁক বলে খানিক ভয়ও হয়। সে কান কাৎ করে তাদের কথাবার্ত্তা শোনার চেষ্টা করে। অনুমান করে তাকে তারা গোদাজাম ঠাউরেছে। তেল, নুন, লঙ্কা মেখে চাখতে চায় কিনা কে জানে?

একজন বলে, "সার্কাসের তাজ্জব চিজ! জানোয়ার না মানুষ?"

অপরজন বলে, "গরীলা টরিলা হবে আফ্রিকার জঙ্গলের।"

"কামড়াবে না ত ?"

"তা হলে খাঁচায় পুরে রাখত।"

ওরা তাকে জানোয়ার ভাবায় হোঁদল রেগে যায়। মুলোর মত দাঁত বার করে বলে, "উজবক।" ধমক খেয়ে ওরা চমকে যায়।

এক বুদ্ধিমান বলল, "মানুষের ট্রেনিং (শিক্ষা) দিয়েছে। পোষাক-আসাক দিয়েছে।"

"ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কঙ্গো বা জাঞ্জিবারের—"

হোঁদল মুখ ভেংচে বলে, "শিম্পাঞ্জী—"

"পোষা হে পোষা। কথাও শিখেছে বেশ! ভারি রগড়ে তামাশা দেখাবে। দেখতে হবে।"—একজন বগল বাজিয়ে বলে।

রেগে গেলে হোঁদলের হুঁশ থাকে না। সে হন্য হয়ে ওঠে। চটেমটে বলে, "তামাশা দেখাচ্ছি এসো।"

"আরে মানুষের মত আস্তিন গুটাচ্ছে! বুনো হলেও গুণপনা আছে।"

তাদের কেউ সার্কাসের মালিককে খবর দেয়। জানায়, এই অদ্ভুত জানোয়ারের এন্তার খেলা তারা দেখতে চায়। সার্কাসের সেরা জন্তু!

সার্কাসের মালিক সেখানে আসেন। মস্তবড় সার্কাস চালান, চৌকস লোক। অনেক দেশের জল খেয়েছেন। ঘুরে ঘুরে বাছাইকরা খেলোয়াড় ও জানোয়ার জোটান। কিসে দর্শক বাড়ে তা বোঝেন। আবার খেলা একখানে পুরাণো হলে অন্যখানে পাড়ি দেন। এভাবে নানান দেশের ভাষাও

খানিক শিখেছেন। কেত্তনের আসরে আনাড়ি হাতের খোলের ঠেকার মত, ঠেকা চালিয়ে যেতে পারেন।

হোঁদলকে ঘিরে ভিড় দেখে, তিনি বুঝে নিলেন, লোকটি সার্কাসে দর্শক টানবে। একে দলে নেওয়া দরকার। তিনি তাকে নিজের তাঁবুতে নিয়ে আদর করে বসালেন। এ কি ভাষা বোঝে তা জানা নেই। তাই নানা ভাষায় বোঝাতে চেষ্টা করে, অবশেষে ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে বললেন, "ঘর কিটার ? (বাড়ী কোথায় ?)"



বোম্বে থেকে বাংলা কোন্‌দিকে হোঁদল জানে না। আন্দাজে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলে, "উধার (ওদিকে)।"

সার্কাস-মালিক বোঝেন না। বলেন, "আফ্রিকা মুলুক ?"

হোঁদল বলল, "তা হতে যাবে কেন ? বাংলা মুল্লুক।"

"বেঙ্গল ? হাম সামাঝ গিয়া। টোমার নাম কি আছে ? (আমি বুঝেছি। তোমার নাম কি ?)"

হোঁদল বুক ঠুকে বলে, "আমার নাম ? কুকুম্মা জানে, হাম্বা জানে, আব্বা জানে, আর তুমি জান না ! হোঁদলরাম।

কুকুম্মা আদর করে ডাকত হাঁহু, দাহু, আর হুষ্টু ছেলেরা ডাকত হোঁদল কুৎকুৎ।”

শুনে সার্কাস-মালিক বলেন, “বহুট্ বড়িয়া নাম (খুব ভাল নাম।) কাম্ টাম্ কুছ হ্যায় (কিছু আছে)? আভি কি কোরে (এখন কি কর)?”

হোঁদল বলে, “কি আবার করি? কত বড় আলকাতরার কারবার ছিল। কালো কুচকুচে মাল। যেখানে লাগে বেহাল। তাই ফেল পড়েছে। এখন দিন ফেরাবার জন্য এখানে এলাম। বাণিজ্যের খোঁজে।”

চোখ পিটপিট করে সে বাণিজ্যের নমুনা বোঝায়।

সার্কাস-মালিক তার কথা মোটেই বোঝেন না। তবু বলেন, “ভেরি গুড (খুব ভাল)। নকরি মাঙ্গটা (কাজ চাও)?”

হোঁদল ঘাড় কাত করে বলে, “হুঁ। সমুদ্দুরে যাবার ময়ুরপঙ্খী নাও আছে?”

সে হাত বাঁকিয়ে ময়ুরপঙ্খীর নমুনা দেখায়।

তার রকম সকম দেখে সার্কাস-মালিকের হাসি পায়। তার এমন ঢঙের চেহারা আর ভঙ্গী যে, সে দাঁড়ালে হাসি পায়, বসলে হাসি পায়, কাৎচিৎ হলে বা বাত্চিত্ করলেও হাসি পায়। তার হাসা, তার গোঁসা—সব হাসি-ঠাসা। একটা আস্ত হাসির পাহাড়কে হুম্ করে কে যেন কাছে বসিয়ে গেছে!

তিনি হেসে বললেন, “মৌড়ফন্কী কৌন্ চিজ হ্যায়? পিকক্ ফ্যান? উ কাম নেহি, সার্কাস কা কাম হায়। টোম কভি হাসেগা, কভি রোয়েগা, কভি চিল্লায় গা, গোস্সা হোগা, ডিগবাজি খায়েগা। এতনা কাম। হাম বিলকুল শিখলায়েগা।

ব্যস্। ক্যা জী, রাজী? (ময়ূরপঙ্খী কি জিনিস? ময়ূর পাখী? ঐ কাজ নয়, সার্কাসের কাজ আছে। তুমি কখনো হাসবে, কখনো কাঁদবে, কখনো চেঁচাবে, রাগ করবে, ডিগবাজি খাবে। এটুকু কাজ। আমি সব শিখিয়ে দেব। কি গো, রাজী?)"

হোঁদল মাথা নেড়ে বলে, "হুঁা। এখন থেকে?"

"নো, নো, ক'রোজ বাড। পহেলা ইস্টাহার ছোড়নে পড়েগা। টুমারা পচাশ রূপায়া টলব মিলেগা। (না, না, ক'দিন পর। প্রথমে বিজ্ঞাপন বিলাতে হবে। তোমাকে পঞ্চাশ টাকা মাইনে দেব।)"

হোঁদল বলল, "উহুঁ।"

"তব্ সোট্টর রূপায়া। (তবে সত্তর টাকা।)"

তার গরজ বুঝে হোঁদল রাজী হয় না। ভাবে পাজি লোকের মত ঠকাতে চায়। বলে, "ছোট ছেলে পেয়ে আমাকে ঠকালে চলবে না। আমি চালাক আছি। তিনকুড়ি টাকার কমে হবে না।"

এ কথা শুনে সার্কাস-মালিকের বেজায় হাসি পায়। হাঁদা লোকটা াক তাজ্জব! এ বয়সেও হিসাব বোঝে না।

তিনি বলেন, "ঠিক হায়। ঐছাই মিলেগা। (ঠিক আছে। তেমি পাবে।)"

"আর কি খেতে দেবে?"

"তলবছে খা লেগা। (মাইনে থেকে খাবে।)"

"মাইনে থেকে! বাঃরে দলের হাতী-ঘোড়া, বাঘটাগকে খেতে দাও না?"

"জরুর ! লেকিন উসিকা টলব নেহি মিল্‌টা। (নিশ্চয়। কিন্তু তাদের মাইনে মেলে না।)"

"বাহারে ! ওরা হ'ল জানোয়ার। ওদের জামা-কাপড় বাক্স-পেটারাই নেই। রাখবে কি করে ? আমি হলাম গিয়ে মানুষ। আমার পকেট আছে।"

সার্কাস-মালিক মুচকি হেসে বলেন, "ইয়াড নেহি ঠা। বহুট আচ্ছা, মিলেগা। টুম ক্যা খাটা ? (খেয়াল ছিল না। ঠিক আছে, পাবে। তুমি কি খাও ?)"

"পোলাউ, মাংস, মিষ্টান্ন, মেঠাই-মণ্ডা।"

"উম্‌দা চিজ ! আউর কেলা ? (ভাল জিনিস আর কলা ?)"

বানর আর হনুমান কলা খেতে ভালবাসে। সার্কাস-মালিক সে কথাই ঠাট্টা করে বলেছিলেন। হোঁদল তা বোঝে না। বলে, "হুঁ, তাও খাই। ক' কাঁদি দেবে ?"

"সাবাস। মিলেগা।"

"এক্ষুণি দাও। ভারি ক্ষিধে পেয়েছে। নৈলে খাটব কি করে ?"

তাকে খাবার-ঘরে নিয়ে খেতে দেওয়া হয়—টোষ্ট, চপ্‌, ফ্রাই, কাটলেট। চেটেচুটে খেয়ে হোঁদল বলে, "পোলাউ, মাংস, মিষ্টান্ন, দৈ কৈ ?"

"অ্যায়সা খানা ইডার নেহি হ্যায়। (এমন খাবার এখানে নেই।)"

হোঁদল বলে, "বললেই হ'ল। হোটেল থেকে আনাও। খেয়ে পেট ঢাক না হলে আওয়াজ বেরোবে না।"

হোঁদল পেট বাজিয়ে শোনায়।

তের

তারপর সার্কাস-মালিক ইংরেজী ও হিন্দী বড় বড় হরফে ফলাও করে বিজ্ঞাপন ছড়ালেন। তার বাংলা তর্জ্জমা এরূপ :—

"দি গ্রেট ব্যাভেরিয়ান সার্কাস। সারা পৃথিবীর নানা দেশে খেলা দেখিয়ে, সবাইকে চমৎকৃত করে, মাত্র কয়েক দিনের জন্য ভারতবর্ষে এসেছে। আসুন, আসুন। যা দেখেন নি, শোনেন নি, এমন সব তাজ্জব ব্যাপার দেখে শুনে, চক্ষুকর্ণ সার্থক করুন!

জন হাফোর্ডের বার-এক্সারসাইজ, মেরী জেসৃমিন বার্ণের আগুনে নৃত্য, মিষ্টার হার্কিউলিসের ও ফ্রাঙ্কেষ্টাইনের রয়াল টাইগার, সিংহ, হাতী ও গরীলার সঙ্গে যুদ্ধ, মিস্ স্কেলিটনের কঙ্কাল নাচ, মিস্ বেলুনের হাওয়ায় সাঁতার। তা ছাড়া, যা কেউ স্বপ্নেও ভাবেন নি, সেই অত্যাশ্চর্য্য খেলা,—হনলুলুর অদ্ভুত জানোয়ার —'হোঁড়ল কুটকুট'এর 'কাতুকুতুর খেলা! জানোয়ারের মুখে মানুষের ভঙ্গী ও জঙ্গী ভাষা,—নানা ঢঙঠাসা হাসাহাসি তামাশা—অবহেলা করবেন না।—দেখে যান সারা সৃষ্টিতে এক অনাসৃষ্টি রহস্যের বৃষ্টি! ছেলে-মেয়ে, নাতিপুতি ও সমস্ত পরিবার নিয়ে এসে খেলার বাহার দেখুন। পরে হাহাকার করতে না হয়!..."

বিজ্ঞাপনে চমৎকার কাজ হ'ল। যেদিন খেলা শুরু হ'ল, ক'ঘণ্টা আগে থেকে লোকের ভিড়। তাঁবুতে তিলধারণের

স্থান নেই। না দেখেই তাদের মুখে 'হোঁডল কুটকুট'এর বাখান। তা যেন রাম না জন্মিতে রামায়ণ।

ট্রপিজ ও সিংহ, বাঘ, হাতী ঘোড়ার খেলা সবাই অনেক দেখেছে। দেখেনি 'হোঁডল কুটকুট'এর তামাশা। শুরু না হতেই কেউ কেউ সার্কাস-মালিককে তাগিদ দেন। তিনি মুখ টিপে মানুষ বুঝে উত্তর দেন, "ওয়েট এ মিনিট প্লিজ,—ঠোরা ঠারিয়ে (খানিক অপেক্ষা করুন)।"

একটু পরে কনসার্ট বেজে ওঠে—ক্লারিওনেট, কর্ণেট ও



ড্রাম। খেলার রিংএ ক'টা ভালুক, হনুমান ও জাম্বুবান তিড়িং-বিড়িং নাচ দেখিয়ে যায়। ওরা যেতে না যেতে 'হোঁডল কুটকুট' এসে চিৎ হয়ে, উবু হয়ে, কাৎ হয়ে ডিগবাজি খায়। সার্কাস-মালিক হোঁদলকে কালো রংএর খাটো প্যান্ট আঁটসাট

করে এ ভাবে পরিয়েছিলেন যে তাকে উলঙ্গ বলে মনে হয়। পেছনে জুড়ে দেওয়া হয়েছে একটা লেজ! তার তেজও কম নয়,—মেঝে চটাস চটাস শব্দ করে! ডিগবাজি খেয়ে, তড়াক করে উঠে সে সৈন্যের কায়দায় স্যালুট করে শেখান বুলি বলে, "গুড্ মর্ণিং জেণ্টলম্যান অ্যাণ্ড্ লেডিজ। উই হ্যাভ্ মেট্



হিয়ার,—বাট্ হোয়াই ডু নট্ নো। (নমস্কর ভদ্র মহোদয়, মহোদয়াগণ! আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি, কিন্তু কেন তা জানি না।)"

হাততালির ধুম পড়ে যায়। ইংরেজী যারা বোঝে তারা দেয়,

—যারা বোঝে না, তারাও দেয়। সবাই বলাবলি করে—"আশ্চর্য্য শিখিয়েছে মশাই! পশুকে মানুষ বানানো বাহাদুরী বটে। ডারউইন সাহেব ঠিক লিখে গেছেন,—বানর, গরীলা, শিম্পাঞ্জী মানুষের পূর্ব্বপুরুষ।"

হোঁদলের কানে এসব আলোচনা পৌঁছায় না। সে অঙ্গভঙ্গী করে নাচে, হাসে, কাঁদে, হিন্দী ও দু-চারটে ইংরেজী কথা বলে, আবৃত্তি করে, ছোটখাট হাসির বক্তৃতা দেয়, চেয়ারে বসে ডিনার খায়। সঙ্গে খাবার জন্য দর্শকদের ডেকে বলে, "কাম প্লিজ লর্ডস্ অ্যাণ্ড লেডিজ। (ভদ্র মহোদয় ও মহোদয়ারা দয়া করে আসুন।)"

দর্শকেরা হেসে গড়ায়। 'তোফা তোফা' বলে হাততালি দেয়। হোঁদল শাসন করে কখনও বলে, "ষ্টপ" (থাম), কখনও "শাট্ আপ" (বন্ধ কর), কখনও "সায়লেন্স প্লিজ" (চুপ)। আবার কখনও নিজেকে বাহাদুরী দিয়ে নিজেই হাততালি দেয়, —বলে, "এনকোর (আবার) কুটকুট।"

দর্শকরা লুটোপুটি খায়। তা খেতে যেয়ে দু-একজন গ্যালারী থেকে গড়িয়ে নীচে পড়ে। আর হোঁদল বলে, "সরি" (দুঃখিত)। যারা গ্যালারী থেকে পড়ে ব্যথা পায়, তারাও হাসে।

তাকে নিয়ে নানান গবেষণা হয়, তর্ক হয়। 'হোঁডল কুটকুট' কোথাকার,—হনলুলু না জিব্রাল্টার, কোপেনহেগেন না পারামারিবো'র, লেপেট্কা না স্কাণ্ডানেভিয়ার, তা নিয়ে দর্শকরা কাঁধ নাড়ে। তারপর দাঁত দেখায় ও হাত গুটিয়ে পেটাপেটির উপক্রম করে।

আগুন নেভাবার জন্য খেলার রিংএর কাছে জলের ট্যাঙ্ক ও হোস্ পাইপ ছিল। কথা নেই, বার্ত্তা নেই, হঠাৎ হোঁদল পাইপ দিয়ে ঝগড়াটে দর্শকদের গায়ে জল ছিটিয়ে দিল—চেঁচিয়ে বলল, "ফায়ার, ফায়ার (আগুন, আগুন),—ডমকল!"

জলে ভিজেও ওরা জল হয়ে গেল। মারামারির জন্য যারা আস্তিন গুটিয়েছিল, তারা তা নামিয়ে দিল।

হোঁদল তার নিজের রসিকতায় আরও রস দিয়ে বলল, "জে-ভি-ডি।"

এক বুদ্ধিমান দর্শক বুঝিয়ে বললেন, "কি বলছে শুনুন। জে-বি-ডি, অর্থাৎ জব্দ :—"

"তাই নাকি?" খুসীতে একজন অপরজনের পিট চাপড়ায়।

যখন এই হাসিহল্লা চলছিল, না-বলা না-কওয়া এক রয়াল বেঙ্গল টাইগার হোঁদলের পেছনে হঠাৎ এসে দাঁড়াল। তার ভয়াল ভঙ্গী দেখে মনে হ'ল রঙ্গ করতে সে আসে নি, এসেছে সবার ঘাড় মটকে রক্তমাংস খেতে। সে ঠোঁট চেটে শব্দ করল, 'হু-উ-উম্' !···

ওরা ভাবল, বিলাত-ফেরত বাঘ ত, তাই ইংরেজীতে বলল, হু উ? অর্থাৎ, তোমরা কে হে? মানুষ? উম্—অর্থাৎ, উম্দা ফলার। দেখে ধুম আহ্লাদ হচ্ছে। এখন হাঁউ-মাঁউ খাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ। পয়লা হোঁদলটাকে খাই, তারপর তোমরা তার ফাউ।

এই না ভেবে দর্শকেরা গেল ভেবড়ে।

আসলে সেটা বুনো বাঘ নয়, সার্কাসের বাঘ। খাঁচার কোণায় আটক থাকে। পাহারাদারের গলতিতে কপাট

আলগা পেয়ে বেরিয়ে এসেছে। এসেই হোঁদলের সঙ্গে মুখোমুখি। মেদমাংস-ঠাসা নাদুস নুদুস খাসা মানুষ, একাই একশ'।

কিন্তু বাঘটা মানুষের চেয়ে অনেক চৌকস। তাকে সে জানোয়ার 'হোঁডল কুটকুট' বলে মোটেই ভুল করল না। নাক টেনে তাকে চিনল, আর ঠোঁট চাটা শুরু করল। এমন বাহারে আহার তার জোটে না! তার নাম যা-ই হোক আসলে মানুষ! দর্শকেরা থ হ'ল,—কোথায় গেল হল্লা আর হাততালি। দেখা দিল খালি ভয়—হোঁডল কুটকুট খেয়ে কার পালা? সবাই চুপ মেরে গেল। এতক্ষণে ব্যাপার বুঝে হোঁদল ভড়কে গেল। সাক্ষাৎ যম তার সামনে। ভয়ে ঠক-ঠক কেঁপে তার দম আটকাল। পথ আগলান, পালাবার যো নেই। যা থাকে কপালে, সে অন্যদিকে চোখ ফেরাল। ভাবল, সে বাঘটাকে না দেখলে সেটাও তাকে দেখতে পাবে না। তা কম ভরসা নয়।

কিন্তু বাঘটা অন্ধ নয়, কানা নয়; দুপুরের শো'র ফর্সা আলোয় সে হোঁদলকে দেখল। কিন্তু টেরা চোখের মারপ্যাঁচ সে জানে না। ভাবল, অত কাছে থেকে লোকটা চোখ পাকিয়ে তাকে দেখছে। পলক ফেলছে না যখন, মস্ত বড় পালোয়ান হবে।—আবার সেটা ছিল বাঘ নয়, বাঘিনী। মেয়ে বাঘ, তাই বেটাছেলের চোখের সামনে দাঁড়াতে তার বিষম লজ্জা হ'ল। চোখ নামিয়ে ঘোমটা-টানা কলাবৌ হ'ল। মাথা গুঁজে নড়ে না, চড়ে না।

তখন হোঁদল ভাবল, বাঘটা তাকে দেখতে না পেয়ে চলে

গেছে। সে আস্তে আস্তে পিছু হটে, এবং তা করতে অজান্তে পড় ত পড় বাঘিনীর পিঠে!

এবার বাঘিনীর ভয় পাবার পালা। মানুষ বাঘের পিঠে চড়ে সে তা বাপের বয়সে শোনে নি। এ নিশ্চয় বাঘের ওপর



'ঘোগ'। তার বদ্‌ রোগের কথাও জানা আছে। বেজায় রাগ। কুস্তির নামে রামধাক্কায় চিৎ করে বাগিয়ে গলা টিপে জীবনের ভিত ভেঙ্গে দেয়।

এমন ঘোরাল-প্যাচাল চিন্তা বাঘিনীকে যেন পেঁচোয় পাওয়াল। সে হোঁদলকে পিঠ থেকে ছিটকে ফেলে দিল

চো-চা ছুট। তারপর একেবারে খাঁচায়। আর অম্নি খাঁচা-রক্ষক দিল কপাট আটকে। সবাই নিশ্চিন্ত হ'ল।

এবার দর্শকেরা ভাবল, এ দৃশ্য খেলার অংশ। ধড়ে প্রাণ আসায় তারা নানা ঢঙে হাততালি দিল। তা আর থামে না। কেউ কেউ হোঁদলকে সিকি, আধুলা, টাকা, নোট ছুড়ে ছুড়ে দিল। হোঁদল ভাবল, তার ভয়ে বাঘ ভেগেছে বলে তার ভাগ্যে এই পুরস্কার লাভ হ'ল। ঘোঁৎঘোঁৎ করে হেসে সে তা তোলে, বাজায়, গুণে দেখে, ঘাড় নেড়ে বলে "থ্যাঙ্কু"। আর হাততালি বেড়ে যায়।

খেলা শেষ হলেও সবার মুখে 'হোঁডল কুটকুট'এর খুঁতহীন খেলার কথা।

সার্কাসের মালিক বুদ্ধি খাটিয়ে খবরের কাগজের সম্পাদকদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তাঁদের চা-খাবারও খাওয়ালেন। তাঁরা কাগজে একতরফা প্রশংসা করলেন। ক্যামেরা দিয়ে হোঁদলের নানা ভঙ্গীর ছবি নিলেন। সে সব ছবি রঙিন কালিতে কাগজে ছাপলেন। টিকিট বিক্রী হুহু করে বাড়ল।

চৌদ্দ

সার্কাসে হোঁদলের আদর খুব বেড়ে গেল। সঙ্গে খাবার ও মাইনে।

ঠাকুরমা তাকে বারে বারে খাইয়ে পেটুক বানিয়েছিলেন। খাও, দাও, ঘুমোও,—কুঁড়ের বাদশা হয়ে দিন কাটাও,—এ শিক্ষাই সে পেয়েছিল।

এখানেও পেটপুরে বারে বারে খাবার অসুবিধা নেই। কিন্তু প্রমাদ বাধল ঘুমের ব্যাপারে। ম্যাটিনী ও রাত্রে দুবার শো। শেষবেলা ও রাত্রে নিটোল ঘুমের উপায় নেই। আবার নতুন উপদ্রব,—সকালে, দুপুরে চিড়িয়াখানার জানোয়ারের মত খাঁচায় থাকা! শয়ে শয়ে লোক দেখতে আসে। তারা তাকে শুয়ে থাকতে দেয় না। শুঁয়োপোকার মত কাঁটা ফুটিয়ে জ্বালা ধরায়। সার্কাসের মালিক থেকে দুগণ্ডা পয়সার টিকিট কিনে, যেন জানোয়ারদের মুণ্ডু কিনে নেয়। তাদের নিয়ে মজা করে, মস্কারি করে, মৌজ করে। ঠাট্টা করে ছুড়ে দেয় ক'টা কলামূলো, ছোলা-মটরের প্যাকেট। আর তার বদলে লাঠি ও ছাতার ডাঁটের গুঁতোগাট্টা!

আগে আসল পশু দেখার রেওয়াজ ছিল। এখন নকল পশুর অর্থাৎ হোঁডল কুটকুটের। দর্শকদের আব্দার!

সার্কাস-মালিক হোঁদলকে বলেন, "মিষ্টার কুটকুট, আড্‌মী লোক টুমকো ডেখ্‌নে মাঙ্গটা। ডিনমে কুছ কাম নেহি। আরামসে খাঁচ্চামে রহো,—টামাশা ডেখলাও। ওভারটাইম মিলেগা চারটে মেঠাই।" অর্থাৎ লোকেরা তোমাকে দেখতে চায়। দিনে কোনও কাজ নেই। আরাম করে খাঁচায় থাক, তামাশা দেখাও। চারটে মেঠাই বাড়তি কাজ বাবদ পাবে।

পেটুক হোঁদলের জিভে জল আসে। আর উপদ্রব মনে হয় না। সে বলে, "উহুঁ চারটে নয়, বারোটা মিষ্টি চাই।"

"এটনা নেহি। পেট খারাপ হোগা। (এত নয়। পেট খারাপ হবে।)"

"হবে না। আমি অনেক খেতে পারি।"

"লেকিন বহুট ডাম। (কিন্তু অনেক দাম।)"

"কিন্তু আমার কামও ত কম না। দিনে ঘুম ছেড়ে লোকের ধুমধাড়াক্কা সওয়া।"

দরাদরি করে আটটা মিষ্টি রফা হয়। হোঁদল আট রকম ফরমাস দেয়, আর তা জোটাতে সার্কাস-মালিকের দফা রফা! হোঁদল বলে, "মিষ্টান্ন খাব, রাবড়ী খাব।"

"উ কৌন চিজ? (তা কোন্ বস্তু?)"

"এত বড় সার্কাস চালাও, আর তা জান না? যে না জানে রাবড়ী-মিষ্টান্ন, সে গুবরের বৃথাই জন্ম।" সে বোঝায়, "গরু চেন? চারপায়ে হাঁটে, হাম্বা ডাকে। তার দুধ।"

"গাইকা ডুঢ? কেটনা মাঙ্গটা? (গরুর দুধ? কত চাও?)"

"উহুঁ কাঁচা নয়, পাকা দুধ। পাক দিয়ে চাল-চিনিতে মিষ্টান্ন আর সর তুলে রাবড়ী।"

কিন্তু সার্কাস-মালিক যা জোটায় তা খেয়ে হোঁদল নাক সিটকায়। গুমরোমুখে চুপটি মেরে খায়। পেট ওকোট-পাকোট করে।

কিন্তু তাতেও সটকান যায় না। সার্কাস-মালিকের কাছে নালিশ হয়, "আপনার তোফা জানোয়ার হোঁডল কেমন যেন চুপসে যাচ্ছে। হাসে না, নাচে না, ভেংচি কাটে না। কি হ'ল? বৌ মরে গেল নাকি?"

"নো, নো। ইঢাড় বহুৎ গড়ম, ইস্‌সে—(না, না, এখানে খুব গরম তাই)"

"হতে পারে। খাঁচায় বরফ দিন, ডাক্তার দেখান। তাজ্জা

করে তুলুন। ও ত রাজা, মশাই। কি তার ভঙ্গী, দেখলেই হাসি পায়। হি হি হি হি—হা হা হা হা—হো হো হো হো—"

আর একজন বলে, "বাঘের সঙ্গে কেমন চমৎকার খেলা দেখিয়েছিল। সেটা কোথাকার বাঘ ?"

"আফ্রিকার।"

"ওদিকে অনেক তুকতাক আছে। একটু তলিয়ে দেখবেন। সেদিন থেকেই যেন মিয়িয়ে যাচ্ছে।"

কিন্তু সার্কাস-মালিক তলিয়ে দেখবেন কি ? তলাতে গেলে নিজেই তলিয়ে যাবেন। মানুষের ডাক্তার, পশুর ডাক্তার—কাকেও আনার যো নেই। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুবে।

ডাক্তার এল না, কিন্তু দর্শকেরা তাকে তাজা করে তুলল। ওষুধ খাইয়ে নয়,—খুঁচিয়ে। হোঁদল মনমরা হয়ে যাক, ওরা চায় না। লাফাক, ঝাঁপাক, ভেংচি কাটুক, তবে ত টিকিটের পয়সা উশুল হবে।

জোর খোঁচা খেয়ে একদিন সে গেল রেগে। বাগে পেয়ে দিল একজন দর্শকের আঙুল কামড়ে। রক্ত বেরুল, তবু দর্শকের কি হাসি ! বলে, "দেখলে হোঁদলের কাণ্ড ! কামড়ে দিলে। কি দুষ্টু !"

হোঁদল বলে, "তুই দুষ্টু, তোর বাপদাদা ইষ্টিগুষ্টি দুষ্টু।"

হাসির ধুম পড়ে। সে সঙ্গে আলোচনা হয়, "দেখেছ মানুষের মত চৌদ্দপুরুষ তুলে গালাগাল দেয় ! হি হি—হো হো—হা হা !"

হোঁদল আরও চটে ; বলে, "তবে কি পশুর মত গাল দেব ? যতো সব বুরবক, উজবক।" তারপর হঠাৎ বাঁ হাতের

চেটোয় ডান হাতের কনুই রেখে, হাতের ফলা তুলে বলে, "বক দেখেছ ?"

এই ভঙ্গীতে বহু রসিকতার ঢঙ্ দেখে, ওরা প্রাণ খুলে হাসে। বলে, "হোঁডল কুটকুট জানোয়ার বললে চটে যায়। মানুষের অনুকরণ করে ময়ূরপুচ্ছ কাকের মত প্রমোশন চায়।"



হোঁদল দাঁত খিঁচিয়ে বলে, "তোর বাপ হোঁডল কুটকুট, —তোর ঠাকুর্দ্দা হোঁডল কুটকুট, তোর চোদ্দপুরুষ হোঁডল কুটকুট।"

সবাই পেট টিপে হাসে। খুসী হয়ে খাঁচার ভেতর বেশী করে কলা, মুলো, শশা, মটর, ছোলা দেয়।···

কিছুদিন পর দর্শকের সংখ্যা কমে আসে। তখন সার্কাসের দল তাঁবু গুটিয়ে অন্য দেশে পাড়ি জমায়। তা ময়ূরপঙ্খী নায়ে হোঁদলের বাণিজ্যযাত্রা নয়। সওদাগর হওয়া তার অদৃষ্টে নেই। সে গাধাবোট হয়ে থাকে।

হোঁদল কুৎকুৎ

সবখানেই হোঁদল কুৎকুৎ দর্শক টানে। সে টানে তার মাইনে বেড়ে দুশো অবধি হয়। পোষাক-আসাক, খোরাক লাগে না। ধীরে ধীরে হোঁদল চালাক হয়। টাকা জমাতে থাকে।

এ দল য়ুরোপের নানা স্থান ঘুরে এশিয়ায় এসেছিল। চীন, জাপান, রাশিয়া, মালয়, ইণ্ডোনেশিয়া প্রভৃতি নানা স্থানে যাবার প্রোগ্রাম। পথে বোম্বে তাঁবু ফেলেছিল। সেখানেই হোঁদলের হবুজীবন শুরু।

সব স্থানে হোঁদলের খেলার একই পদ্ধতি। সেই জানোয়ার সেজে থাকা। সার্কাস-মালিক ক্রমে ক্রমে তাকে খানিক স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। ফাঁকে ফাঁকে সে আফিস-ঘরে বসে। চুপ করে দলের কাজকর্ম্ম ও হিসাব-নিকাশ দেখে। আর বালিতে ঘসা খাওয়া ভোঁতা অস্ত্রের মত তার হাঁদা মগজ ধারাল হয়।

সে দেখে, সার্কাসের মালিক ও তাঁর দলের লোক কেমন কষ্টসহিষ্ণু, কর্ম্মঠ আর চট্‌পটে। এত বড় দলের লোকের খাওয়া-দাওয়া, তদ্বির-তদারক ও দু-তিন বার খেলা দেখাবার ব্যবস্থায় তাদের হাঁফ ছাড়ার সময় নেই।

রাত আড়াইটার আগে ওরা শুতে পারে না, আবার ওঠে সাড়ে চারটায়। জানোয়ারগুলোকে সামলানও কম ঝামেলা নয়। অথচ সব চলে কলের মত। কোথাও গোলমাল হয় না।

তুখোর সার্কাস-মালিক মিষ্টি কথায় সবাইকে তুষ্ট রাখেন, কুড়েমী না করে সবার সঙ্গে খাটেন। হিসাব-নিকাশ নিজে রাখেন, পাওনা মিটিয়ে দেন; খিটিমিটি করেন না।

হোঁদল কুৎকুৎ

ঠাকুরমার প্রশ্রয়ে, ধনী বাপের আশ্রয়ে এবং ওছা মাষ্টারের কাছে অশিক্ষা পেয়ে, হোঁদল কুড়ের বাদশা ও গবেট হয়েছিল। তারপর বড় রকম চোট পেয়ে যখন নিরাশ্রয় হ'ল, তখন ভেসে এল এই সার্কাসের দলে। এখানে তার হাতে কলমে শিক্ষা হ'ল পাকা ব্যবসায়ীর চালচলন দেখে।

তার মনে হ'ল, এও কুকুম্মার মুখে শোনা সওদাগর পুত্রের বাণিজ্যযাত্রার মত। কোথা থেকে কোথায় পাড়ি জমিয়ে কেমন পয়সা কামায়! তার জন্য শরীরের ঘাম ফেলতে পিছপা নয়।

তার শরীরে পূর্ব্বপুরুষের ব্যবসায়ী রক্ত ঝিমিয়ে ছিল। তা নাড়া খেয়ে জেগে উঠল। তার মনে হ'ল, ব্যবসা ফাঁদা মোটেও ছাদা কথা নয়। খালি কুড়েমীর কাছে নিজকে বাঁধা দিয়ে মানুষ গাধা বনে যায়। তাই সে পরের ফাঁদে কাঁধ বাড়িয়ে জানোয়ার বনে গেছে। ঠকাচ্ছে নিজেকে ও অপরকে!

পেছনের কথা ভেবে তার আপশোষ হয়। লেখাপড়া ও পরিশ্রম করা তার মনে হয়েছে লোহার মটরের মত শক্ত। আজ তা ভাজা মটরের মত সহজ বোধ হয়। ভাঙ্গা কঠিন নয়, ভেঙ্গে চিবুতে মজা। কেমন সোঁদা গন্ধ আর স্বাদ।

দলের সঙ্গে বোম্বাইর নানা সহর ঘুরে হোঁদল ইংরেজী খানিক শিখে নিয়েছে,—হিসাব-নিকাশও। দর্শকের কাছে সে জানোয়ার; কিন্তু দলের কতক লোকের কাছে সে মানুষ। তাদের মধ্যে ভালো-মন্দ আছে। সে ভালোদের বেছে নিল, আর তাদের কাছে পেল আলোর দিশা।

দলের সঙ্গে পাঁচ বছরের চুক্তি হয়েছিল। দেড় বছর

কায়ক্লেশে কেটেছে, আরও সাড়ে তিন বছর বাকি। ফাঁকি দেবার যো নেই। কিন্তু ভালোদের একজন গোপনে ফাঁক বাতলাল; বলল, "সার্কাস-মালিক তোমাকে দিয়ে পয়সা কামায়। তার মাথায় তোমাদের কলকাতা সহরে যাবার আইডিয়া (পরিকল্পনা) ঢুকিয়ে দাও। সেখানে জানাশুনো কাউকে পেলে জানাও যে, মানুষকে জানোয়ার সাজিয়ে সে লোক ঠকিয়ে পয়সা কামাচ্ছে। তখন ঠকবাজি ধরা পড়ার ভয়ে তোমাকে ছেড়ে দেবার পথ পাবে না।"

এ পরামর্শ হোঁদলের মনে ধরে। সে সার্কাস-মালিককে নিরিবিলি পাবার জন্য তক্কে তক্কে থাকে।

পনের

অবশেষে একদিন সার্কাস-মালিককে নিরিবিলি পাবার সুযোগ আসে। হোঁদল সার্কাস-মালিককে বলে, "আজ তোমার সঙ্গে বসে খাবার খেতে ইচ্ছে হচ্ছে।"

"হোয়াই? (কেন?)"—সার্কাস-মালিক বলেন।

"তোমার খানা খেয়ে কালো রং যদি ধলা হয়!"

হোঁদলের কথায় যুক্তির বালাই নেই। থই পাওয়া ভার।

তিনি হেসে বলেন, "সাডা হোনে মাঙ্গটা? খানাছে নেই হোগা। ব্লেক্ সি মে আস্নান কিয়া। য়ুরোপ যানে বখট হোয়াইট সি মে বাঠ লে লেও। (সাদা হতে চাও? খাওয়াতে হবে না! কৃষ্ণসাগরে স্নান করেছ। য়ুরোপ যাবার সময় শ্বেতসাগরে স্নান করে নিও।)"

হোঁদল কুৎকুৎ

হোঁদল কারবারে দেদার রোজগার করে দেওয়ায় তার আব্‌দার পালা দরকার। তাই তুপুরের আহারের সময় সার্কাস-মালিক তাকে ডাকলেন। খাবার ঘরে ত্ব'জনে বসলেন।

তাঁর হুকুমে ত্ব'জনের লাঞ্চ এল। খেতে খেতে একথা সে-কথার পর হোঁদল বলল, "স্যর্, এ দেশের আসল জায়গায়ই যাও নি। সেখানে খুঁতিভরা টাকা।"

"হোয়ার? কিঢার? (কোথায়? কোন্ দিকে?)"

"কলকাতায়। যত পয়সা সেখানে। বোম্বে সহরে এক মাসে যা কামিয়েছ, কলকাতায় তা পনের দিনের ওয়াস্তা।"

"অ্যায়সা? ইঢার খটম কর্‌কে যায়েগা। (এমন! এদিক শেষ করে যাব।)"

"উহুঁ উহুঁ। দেরী করো না। পাটের ফসল কমে যাওয়ায় লোক গরীব হয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া এখন ফলফলারির দিন—আম, কাঁঠাল, কালোজাম।"

হোঁদল জিভ নেড়ে তার স্বাদ বোঝায়। তাতে খাবার সাধ হয়।

সার্কাস-মালিক এসব ফলের গুণগ্রাম বইতে পড়েছেন, কিন্তু খাবার সুযোগ পান নি। তিনি রাজী হন। অমৃত ফলের সিজন্ (মরশুম) সেখানে কাটান মন্দ নয়। নানা পাখীর গানও শোনা যাবে, অর্থাৎ এক ঢিলে তিন পাখী—টাকা রোজগার, মিষ্টি আম খাওয়া আর পাখীর গান শোনা। এক দেশে ত্ববার যাবার কথা নয়। তবু অন্য স্থানের প্রোগ্রাম ছেটে, তাঁবু তুলে দলবল নিয়ে তিনি কলকাতায় যান।

গড়ের মাঠে তাঁবু ফেলেন। ঝলমল আলোর রোশনাই ও

চকমকে বিজ্ঞাপনে লোকের মন আইঢাই করে। সবার মুখে হনলুলুর হোঁডল কুটকুটের অদ্ভুত বিবরণ। এই সঙ্গে কেউ ডারউইনের অনুমানও টেনে আনেন, অর্থাৎ ম্যামেল, গিরগিটি, বানর, বনমানুষের কথা। তারাই মানুষের পূর্ব্বপুরুষ। হোঁডল কুটকুট যেন খুট্ করে তা খুলে দেখায়। কেউ বলে—

"হোঁডল কুটকুটের করিত কর্ম্ম
না দেখলে বৃথাই জন্ম।"

অত বড় তাঁবুতে স্থান হয় না। লোকের মাথা লোকে খায়—চিবিয়ে নয়, গিলে নয়, টিকিট কেটে।

হোঁদল নাচে, কাঁদে, গায়, হাসে, ভেংচি কাটে। কিন্তু এবার তার চোখ দর্শকের উপর থাকে। মুক্তির ফন্দী সে এঁটে রেখেছে, আর বন্দী থাকা নয়। একটি চেনা লোক পেলেই হয়। দেশের মাটিতে সে আশা মাটি হবার নয়। সত্যি সে সুযোগ পরিপাটি এল।

হঠাৎ একদিন সে দেখল, দাড়িওয়ালা সেই বৈজ্ঞানিক মাষ্টার সার্কাস দেখতে বসে অঙ্ক কষছেন। তাঁর হাতে কাগজ ও পেন্সিল।

তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য হোঁদল আগু বেড়ে, ঘুঙুর পায়ে ঝুমুর-ঝুমুর নেচে গান ধরল—

"দাড়ি মাষ্টার অঙ্ক কষে
মাথা ঘোরাও বসে বসে।—
হোঁদল নাচ যে তারই ফল,
নাচ থামাবার কি কৌশল?"

আঁক কষায় বেহুঁশ মাষ্টার এর অর্থ নিয়ে মাথা ঘামান না।

তিনি একবার মুখ তুলে জানোয়ারটাকে দেখেন। তার মুখে শুধু মানুষের ভাষা নয়, খাসা কবিতা! তিনি আবার অঙ্ক কষে দেখেন, যে অনুপাতে পশুরা ধারাল এবং মানুষ ভোঁতা হচ্ছে, তাতে কত দিনে পশুরা মানুষ আর মানুষেরা পশু হবে।

মাষ্টারের কন্‌সেশন টিকিটে তিনি এসেছিলেন। দূর আফ্রিকার পশুদের দেখে শুনে চোস্ত করে অঙ্ক কষবেন। চমৎকার আবিষ্কার হবে। দূরের পশুর ভবিষ্যতের চিন্তায়, কাছের ছাত্রপশুকে পুরস্কার দেবার কথা তাঁর খেয়াল হ'ল না। তিনি তাকে চিনলেন না। সার্কাস শেষ হতে আঁককষা কাগজ-পত্র নিয়ে উঠে গেলেন। নাকের ছেঁদা টিপে পা বাড়াতে ভুল হ'ল না। খালি ভুল হ'ল হোঁদলকে টিপে পরখ করতে।

ক'দিন পর সেই পণ্ডিত মশাই সার্কাস দেখতে এলেন। নামাবলী গায়ে, টিকিতে ফুল বাঁধা। ইতিমধ্যে কাটা টিকি বেশ বড়সড় হয়েছে। তিনি আঁক কষলেন না। সতৃষ্ণ চোখে হনলুলুর হোঁডলকে দেখে তার গায়ের চর্ব্বির হিসাব করলেন। কিন্তু ছাত্র হোঁদলকে চিনলেন না।

হোঁদল খানিক আগু বেড়ে হাত জুড়ে বলল—

"টিকির ডগায় ফুলের গোছা
পাঁঠা-খেকো বামুন ছোঁচা।
টিকিট কেটে এলে সোজা,
কি দেখতে যায় না বোঝা।
ছাত্রে বানাও বুনো হোঁদল,
ঘরে নেবার কি কৌশল ?"

বুনো জানোয়ারের মুখে ঝুনো মানুষের কবিতা! শুনে পণ্ডিত

মশাই মনে মনে খুসী হন না। বলি দেবার জন্য কাঠগড়ায় পুরলে এরা হৈ-হুল্লোড় জুড়বে। অথচ চর্ব্বিঠাসা এমন পশুতে খাসা তেলের বড়া হতে পারত। সার্কাস শেষে এ আপশোষ নিয়ে তিনি বাড়ী যান।

আর একদিন এলেন সেই যাত্রার দলের মাষ্টার, যিনি বেহালার ছড় দিয়ে পিটিয়ে গাধাকে ঘোড়া করেছেন, ঘোড়াকে হাতী। হয়ত হাতী থেকে কি করে 'হোঁডল' বানান সম্ভব, তা জানতে তিনি এসেছিলেন। হোঁদল তার সন্ধান দিয়ে ছড়া কাটল—

"যাত্রার দলে বেহালা বাজান,
দল ভাঙ্গতে ছাত্র পড়ান।
গাধা পিটে বানান ঘোড়া,
ছাত্র মেরে করেন খোঁড়া।
বন্ধ আছে ছাত্র হোঁদল,
মুক্ত করার কি কৌশল ?"

মাষ্টার ভাবেন, এ ছড়া যাত্রাগানে মানানসই হতে পারে। তিনি গুনগুন্ করে সুর ভাঁজেন। হোঁদলের আসল হদিস খোঁজেন না। খেলা শেষে গোঁফ মুচড়ে চলে যান।

হোঁদল মনে মনে মাথা চাপড়ায়। এরাই একদিন তার মাথা খেয়েছে। তা বলে তাঁদের একটুও অনুতাপ নেই!

দিন বসে থাকে না, হেসে কেঁদে চলে। অবশেষে হাসার দিন এল।

হোঁদল দুপুরবেলা খাঁচার ভেতর ঘুমিয়েছিল। হঠাৎ জোর খোঁচা খেয়ে জেগে উঠল। এলোমেলো চিন্তায় মনটা

কালো হয়েছিল ; কারণ মাষ্টাররাও তাকে আমল দেয় নি। সে রেগে গিয়ে গল্‌গল করে শক্ত গালাগাল শুরু করল। হনলুলুর জানোয়ারের মুখে অনর্গল চোস্ত বাংলা শুনে খটকা লাগে। খোঁচা দিয়েছিল হোঁদলের সহপাঠী প্রতাপ। সে ভাবল যত পোক্ত শিক্ষকই শেখাক, জানোয়ারের মুখে হুবহু মানুষের ভাষা ফোটাতে পারে না। তা ছাড়া গলার স্বর ভারি চেনা। তখন ব্যাপার বোঝার জন্য সে হোঁদলকে তুলোধূনো করে দেখতে লাগল।

প্রতাপকে মুখোমুখি দেখে এবার হোঁদল চিনল। তার সঙ্গে সে একদিন স্কুলে পড়েছিল, ঝগড়া, মারামারি করেছিল। তারপর ছাড়াছাড়ি হতে আর দেখা হয় নি। কিন্তু আজ নিজের গরজে হোঁদল তাকে চিনে নিল। কিন্তু প্রতাপ চিনল না হোঁদলকে।

তখন হোঁদল শান্ত গলায় বলল, "চিনতে পারলে না? আমি হোঁদল। একসঙ্গে স্কুলে পড়েছি। তুমি ছড়া কেটে বলতে—

'হোঁদল কুৎকুৎ ফোঁসমনসা,
তিনটি বিকায় আধ পয়সা।
আস্ত গাড়োল জংলী খাস,
কুড়িয়ে খায় পচা ঘাস।'

ঠিক বলেছিলে ভাই। পচা ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছি। বাপের পয়সার দেমাকে, ঠাকুরমার আহ্লাদে তখন বুঝি নি। তাই জানোয়ার বনে গেছি। বেরুবার পথ খুঁজে পাই না।" বলে সে হঠাৎ কেঁদে ফেলল।

এবার প্রতাপ হোঁদলকে চিনতে পারল। তাকে কাঁদতে দেখে তার মায়া হ'ল। সে আর ছোটটি নেই। বড় হয়ে ছেলেবেলাকার ঝগড়া-খুনশুটির খুটিনাটি কথা ভুলে গেছে।

সে অবাক হয়ে বলল, "তা এমন হাল হ'ল কেমন করে? বেভেরিয়ার সার্কাস পার্টিতে ঢুকে, পশু সেজে লোক ঠকাচ্ছ কেন?"

তখন এদিক-ওদিক চেয়ে, হোঁদল খাটো গলায় সব বলল। প্রতাপ খুঁটে খুঁটে শুনল।

হোঁদল মিনতি করে জানাল, "জানোয়ার সেজে দম্ বন্ধ হবার মত হয়েছে। অথচ চুক্তির মেয়াদ ফুরাতে ঢের বাকি। পালিয়ে গেলে ধরে জেলে দেবে।"

প্রতাপ বলে, "এমন! কিন্তু তোমার চেয়ে সার্কাসওয়ালা বেশী ঠকবাজ। তোমাকে আটকাতে গেলে নিজে আটক পড়বে। পালাবার পথ পাবে না। দাঁড়াও, বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে দেখি।"

প্রতাপের বাবা প্রমথবাবু ঝুনো উকিল। আর প্রতাপ হালে ওকালতি পাশ করে, বাবার সঙ্গে কোর্টে বেরুচ্ছে।

ষোল

বাড়ী ফিরে প্রতাপ তার বাপকে হোঁদলের কথা জানাল। সব শুনে তিনি বললেন, "এমন! ভারি ধড়িবাজ ত। সার্কাস-মালিক এভাবে লোক ঠকানো ব্যবসায় করে নানা দেশ চষে বেড়াচ্ছে! সাহস ত কম নয়। দাঁড়াও, দিচ্ছি ভিট্ করে।

সাপের ছুঁচো-গেলার মত ও ছোকরাকে ছেড়ে পালাবার পথ পাবে না।”

প্রমথবাবু কর্পোরেশনের একজন কর্ম্মকর্ত্তা। তিনি ক'জন গণ্যমান্য লোক নিয়ে সার্কাসে হোঁদলের খেলা দেখে এলেন। এক ছুটির দিন দুপুরে খাঁচায় পোরা হোঁদলকেও দেখলেন। ফাঁক করে আলাপ করলেন। সার্কাস-মালিকের বেবাক চালাকি টের পেলেন।

তারপর গুচ্ছের দস্তখৎ নিয়ে, এক রেজেষ্ট্রী চিঠি সার্কাসের মালিককে ছাড়লেন। ইংরেজী চিঠি, তার বাংলা তর্জ্জমা এরূপ :—

প্রিয় মহাশয় !

আপনি এই কলিকাতা সহরে কিছুদিন ধরে সার্কাস দেখাচ্ছেন। জোরাল বিজ্ঞাপন দিয়েছেন যে, হনলুলুর অদ্ভুত জানোয়ার 'হোঁডল কুটকুট' শিক্ষার গুণে মানুষের মত কথা বলে, গান গায়, নাচে-কোঁদে, চেয়ারে বসে খানা খায়। পশুকে নাকি এর আগে এমন করে কেউ তৈরী করতে পারে নি। তার খেলা নানা দেশে আদর পেয়েছে। তার খেলা যে না দেখেছে তার জীবন বৃথা।...আপনার বিজ্ঞাপনের চটকে এ সহরের বহু নিরীহ লোক আটক পড়ে, প্রতিদিন ঠকে গেছে, এ মর্ম্মে বহু চিঠি আমাদের কাছে পাঠিয়েছে। অবশ্য আমরা তা সঠিক মনে করি না। তবে ওরা যখন খটকা তুলেছে, কপাট খুলে চোখ মেলে দেখা দরকার। তাতে দু'পক্ষেরই ঝড়ঝাপ্টা কেটে যাবে। তাই আমরা কর্পোরেশনের কয়েকটি বিশিষ্ট লোক পশু-ডাক্তার সহ পরীক্ষা করতে যাব। শীঘ্র তারিখ

ঠিক করে জানাবেন। আমরা সে অনুযায়ী আগাম টিকিট কিনে যাব।

আর যদি তা না করেন, আমরা অনুমান করতে বাধ্য হ'ব যে, সন্দেহ সঠিক এবং যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হ'ব। পৌর চালকদের জনসাধারণের অভিযোগ খণ্ডন করা প্রয়োজন।...

চোস্ত ভাষায় জবরদস্ত ইঙ্গিত,—গলা ছেড়ে হাড়গিলার সঙ্গীত! সার্কাস-মালিকের চোখ ছানাবড়া হয়। ভাবেন, এ কিরে বাবা,—হাতী-ঘোড়া গেল তল, ছুঁচো বলে কত জল! কত বড় বড় দেশ চষে এখানে এসে ফাঁসে আটকান! এই ওছা জায়গার লোক মাকি খোল-করতাল পিটায়, গঙ্গাজল ছিটায়, দেবতার নামে গলা ফাটায়,—অথচ বিশ্বাসের বেলা ঠুঁটো। আস্ত নাস্তিক! খায় ত ভাত, ডাল, কাঁচাকলা, কচুপোড়া। তা খেয়েও মগজের কূটবুদ্ধি কত! কুট্ করে সূঁচ ফুটিয়ে দেয়!...মনে মনে এমনতর গালাগাল দিলে কি হবে? কেমন যেন তালগোল লাগে।

সার্কাস-মালিক চিঠি লুকিয়ে, হোঁদলকে আড়ালে ডেকে বলেন, "মিষ্টার হোঁডল, ইধারকা মেয়াড খটম হো গিয়া,—আভি ঘড় লোটেঙ্গে। (এদিকের মেয়াদ শেষ, এবার ঘর ফেরার পালা।)"

"ঘর ফিরে যাচ্ছেন? কিন্তু এখানে আরও ছ'মাসের মেয়াদ ছিল।"

"ছোড়কে যাটা। হিঁয়া বহুট্ গড়ম। আরাম ছুট্ গিয়া। (ছেড়ে যাচ্ছি। এখানের গরমে আরাম ভেঙ্গে গেছে।)"

হোঁদল বলে, "এক কাজ করলে হয়। বরফ-ভেজান কম্বল সম্বল করে—"

"নো, নো। ঐছে নেহি হোগা। শীট মুলুককা আডমী,—থোড়া বরফসে ক্যা ফয়দা? টোম্ বহুট্ কাম কিয়া,—ঠ্যাঙ্কস্। আপনা মুলুকমে তুমকো ছোড় যাটা। (না না, ও দিয়ে হবে না। শীতের দেশের লোক, অল্প বরফে কি হবে? তুমি অনেক কাজ করেছ,—ধন্যবাদ। তোমাকে নিজের দেশে ছেড়ে যাচ্ছি।)"

হোঁদল বোঝে, পাখী ফাঁদে পড়েছে। তাই উড়ে যাবার জন্য ধড়ফড়ানি। সে উল্টো চাল দিয়ে বলে, "না, না,—মায়া পড়ে গেছে। আমিও যাব।"

"কাহে? টোমারা বুড্ডা বাপ হ্যায়। বাহার যানেছে কষ্ট হোগা।" (কেন? তোমার বুড়ো বাপ আছে। বাইরে গেলে তার কষ্ট হবে)।

"আমার বাবা বেঁচে নেই।"

"মাটারি হায়। (মা আছে।)"

"মাও নেই।"

"ওয়াইফ হ্যায়। ইষ্ট্রী ছোড়কে মাৎ যানা। (স্ত্রী আছে। তাকে ছেড়ে যেও না।)"

হোঁদল জানায় যে তার স্ত্রীও নেই।

"ভাই বহিন্ জরুর হ্যায়। রোয়েগা। কেটাব মে 'উই আর সেভেন' পড়া নেহি? 'ও কল্ মাই ব্রাডার ব্যাক্ টু মি, আই কেনট্ প্লে এলোন!' (ভাই-বোন নিশ্চয় আছে, তারা কাঁদবে। বইতে 'আমরা সাতজন' কবিতা পড়

নি? 'আমার ভাইকে ডেকে দাও,—আমি একা খেলতে পারি না।')"

হোঁদল পাল্টা কবিতা শোনাল,—

"আমার আবার একলা থাকতেই ভালো লাগে,
কারণ তাতে সকল খাবার মেলে একার ভাগে।"

ফ্যাসাদে পড়ে সার্কাস-মালিক বোঝাতে চায় যে, বেশীদিন জানোয়ার সেজে থাকা মানুষের পক্ষে ভালো কথা নয়! কিন্তু হোঁদল চালাক হয়েছিল! সে বলল, "ঢাক-ঢোল পিটিয়ে আমাকে জানোয়ার বানিয়েছ। মানুষ বললে, এখন লোকে মানবে কেন? চলে যেতে ঠেঙ্গিয়ে যদি মারে।"

"নেহি মারেগা। টুম্ রহা যাও। (মারবে না। তুমি থেকে যাও।)"

"আমার ভয় করে। আমি তোমার আবডালে জানোয়ার হয়ে থাকব।" হোঁদল হাত কচলায়।

"টোম্ জানোয়ারকা লায়েক ভি নেহি। বর্বাড হো গিয়া। টুম্হারা খেল দেখকর আডমি লোগ আভি ঢিল মারটা। পার্টি টোম্ ডরিয়া মে ডাল দিয়া। (তুমি জানোয়ারের লায়েকও নেই। সব নষ্ট করেছ। তোমার খেলা দেখে লোক ঢিল মারে। পার্টি নদীতে ডালি দিয়েছ।)"

"তা হলে ডুব মেরে তুলে দি।"

"নেহি সেকোগে। টুমহারা টাগড টুট্ গিয়া। (পারবে না। তোমার শক্তি নষ্ট হয়েছে।)"

হোঁদল কাঁদ-কাঁদ মুখে বলে, "তা হলে নিতান্ত ছাড়িয়ে দেবে?"

"ইয়াস্। কেট্‌না ডফে বোলে গা? (হাঁ, কতবার বলব?)"

"তা হলে আমার হিসাবটা," মাথা চুলকে বলে হোঁদল।

"হিসাব? আউর ভি টিন বরস টুমহারা নোক্‌ড়ীকা বাট ঠা। হাম আপোষ ডে ডেটা। (হিসাব? আরও তিন বছর তোমার চাকুরির কথা ছিল। আমি অমনি ছেড়ে দিচ্ছি।)"

"বা-রে। আমি ত ছাড়ছি না,—তুমি ছাড়াচ্ছ। তাই যা চুক্তি ছিল—"

"উ কুছ নেহি। বাটকা বাট ঐছা কন্‌ট্রাক্ট হুয়া, আউর (ও কিছু নয়। বাতকে বাত ও রকম চুক্তি হয়েছিল। আর—)"

"আর বাতকে বাত হিসাব করে টাকা দিয়ে দাও। ভদ্রলোকের বাত আর হাতীর দাঁত খতের চেয়েও বেশী দামী। আমিও থ্যাঙ্কু বলে চলে যাই।"

সেই হোঁদল আজ কথা শিখেছে। শুধু তাই নয়, কথার মারপ্যাঁচে বদখত ইশারা করছে। সার্কাস-মালিক রাগে দিশা হারিয়ে, চোখ লাল করে বলেন, "ক্যা—ডর ডেখাটা। নেহি ডেঙ্গে। (কি, খতের ভয় দেখাও,—দেব না।)"

"ঠিক? নিমক খেয়েছি, নিমকহারামী করার ইচ্ছে নেই। কিন্তু ঠকাতে চাইলে হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গতে হবে। মানুষকে জানোয়ার সাজিয়ে পয়সা কামানো আইনে মানা। তা জানা নেই?"

এবার সাপের ফণায় সাপুড়ের ওষুধ পড়ে। কর্পোরেশনের চিঠি এসেছে। ওরা তদন্ত করতে চায়। জানোয়ার হোঁডলের

যোগ-সাজস আছে কি না কে জানে? কেঁচো মাড়াতে গিয়ে সাপের ছোবল খেতে না হয়।

সার্কাস-মালিক তুখোর লোক। ভড়কান, তবু ভেংচি ছাড়েন না; মচকান, তবু ভাঙ্গেন না!

হঠাৎ হোঁদলের পিঠে হাত দিয়ে তিনি বললেন, "ক্যা জী, ঠাট্টা নেহি সম্‌ঝাটা? টুম প্যারা আডমী, কিটনা কাম কিয়া। ছোড় যানে কিটনা ডড়ড হোথা। হিসাব জরুর ডেঙ্গে। (কি গো, ঠাট্টা বোঝ না? তুমি পিয়ারের লোক, কত কাজ করেছ। ছেড়ে যেতে কি কষ্টই না হচ্ছে। নিশ্চয় হিসাব দেব!)"

তিনি চেষ্ট খুলে হিসাবের খাতা বার করেন। হিসাব করেন, দেদার দর কষেন,—তারপর কিছু কেটে-ছেটে তার পাওনা সাত হাজার দুশো টাকা গুনে দেন।

হোঁদল দুশো টাকা ফিরিয়ে দেয়। সে গোঁসা হয়েছে মনে করে সার্কাস-মালিক জিজ্ঞেস করেন, "কাহে?"

হোঁদল বললে, "জানোয়ারদের খেতে দিলেম। ওরা ক্ষিদেয় কাতরায়।"

"ঠ্যাঙ্কস্। টুমারা নাম কর্‌কে খিলায়েঙ্গে। গুড্ নাইট। (ধন্যবাদ। তোমার নাম করে খাওয়াব। শুভরাত্রি।)"

সত্যি খাওয়ায় কিনা তা দেখার অপেক্ষা না করে, হোঁদল পোষাক বদলায়। তারপর সভ্য-ভব্য হয়ে তল্পী নিয়ে তাঁবু থেকে বেরোয়।

সতের

হোঁদল চলে যেতে সার্কাস-মালিক হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। মনে মনে ভাবেন, বাপস্! কি আপদেই না পড়া গিয়েছিল। সাপের ছুঁচো ধরার মত.—গেলা যায় না, ওগড়ানও যায় না। কিন্তু অনেক আক্কেল-সেলামী দিয়ে মন চড়-চড় করে। এ যেন নিজের গালে নিজের হাতে চড় খাওয়া। তবে মগজওয়ালা লোকেরা বলে, সর্ব্বনাশ এলে অর্দ্ধেক ছেড়ে দেওয়া উচিত। আর মানুষটাকে জানোয়ার বানিয়ে মুনাফাও কম হয় নি।—পেটে খেলে পিঠে সয়। এখন গুটিয়ে যেতে পারলেই সোয়াস্তি। কিন্তু গলায় কাঁটা ঠেকে আছে। তা নামাবার জন্য ফিকির-ফন্দীর ও বেড়ালের পায়ে ধরার ব্যাপার আছে। তাই মাথা খাটিয়ে তিনি ইংরেজী ও বাংলায় এই রকম বিজ্ঞাপন ছড়ালেন—

"দুঃসংবাদ !!!

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানান হচ্ছে যে, হনলুলু হতে আনা দি গ্রেট্ বেভেরিয়ান সার্কাসের অদ্ভুত জানোয়ার 'হোঁডল কুটকুট' হঠাৎ উধাও হয়েছে। দুপুরের আহারের পর সার্কাসের লোকেরা বিশ্রাম নিচ্ছিল। খাঁচা-রক্ষক হয়ত সাবধান মত খাঁচা বন্ধ করে নি। হোঁডল সে সুযোগ নিয়েছে। দেশের আবহাওয়া সহ্য না হওয়ায় ইদানীং সে মনমরা হয়েছিল। বোঝা যাচ্ছিল সে দেশে যেতে চায়। শুধু আপনাদের আনন্দ দেবার জন্য তাকে যেতে দেওয়া হয় নি। কিন্তু তাকে আটকান গেল না

বলে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। সার্কাস পার্টিরও যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। যদি হোঁড়ল কুটকুটকে কেউ খুঁজে পান এবং আমাদের হাতে জ্যান্ত অবস্থায় তুলে দেন, আমরা তাঁকে এককালীন এক হাজার টাকার খুঁতি পুরস্কার দেবার অঙ্গীকার করছি। ...

বিজ্ঞাপন পড়ে সহরের লোকেরা ভারি বেজার হ'ল। দোকানে বাজারে আলোচনা হ'ল হোঁড়ল কুটকুটের রগড়ে ব্যাপার। তারপর আর কিছু করার না পেয়ে, মধুর বদলে গুড় খাবার মত তারা আবার হোঁড়ল ছাড়া সার্কাস খেলা দেখতে লাগল। শেষটা রামছাগল, গরীলা, শিম্পাঞ্জী, বানর দিয়ে আসর জমাবার চেষ্টা। কিন্তু অদ্ভুত জানোয়ার হোঁড়লের ভাঁড়ামী ছাড়া কেউ বেশ মজা পায় না।

ওদিকে হোঁদল মুক্তি পেয়ে সটান প্রতাপের বাড়ী হাজির হ'ল। প্রতাপ তাকে অভ্যর্থনা জানাল। তখনও সে বিয়ে করে নি। নিজের ঘরে তার স্থান করে দিল। ছুটির দিন। খাওয়া দাওয়ার পর ছেলেবেলাকার দুষ্টামী-নষ্টামীর আলোচনায় প্রাণভরে হাসাহাসি করল।

তারপর কাজ-কারবারের কথা উঠল। প্রতাপ বলল, "ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্য। সাত হাজার টাকা পুঁজি পেয়েছ। তাই মূলধন করে ব্যবসা ফাঁদ।"

হোঁদল বলল, "কি ব্যবসা, তুমি ভেবে বাতলাও। আমি ত খালি ডিগবাজি খেতে আর পিছলে পড়তে জানি।"

দু'দিন পর কাছারির ফেরতা বাড়ী এসে, এক সঙ্গে জলযোগ করতে করতে, প্রতাপ হোঁদলকে সার্কাস-মালিকের বিজ্ঞাপন

দেখাল। হোঁদল পড়ল, কিন্তু কি গ্যাঁচ কষার জন্য প্রতাপ তা এনেছে তা আঁচ করতে পারল না। প্রতাপ বলল, "এটা কাজে লাগবে বলে এনেছি। বাঘের উপর ঘোগ, মামদোর উপর কন্দকাটা ভূত আছে সে জানে না ত। চল আর এক হাত নিয়ে নি। হোঁদলকে জ্যান্ত হাজির করলে নগদ এক হাজার টাকা দেবে। তা ছাড়া আরও কিছু দক্ষিণা দিয়ে বাঁচার পথ খুঁজবে।"

হোঁদল বলে, "কাজ নেই ভাই। যথেষ্ট হয়েছে। যা চটে আছে, খাঁচা খুলে বাঘ-ভালুক না লেলিয়ে দেয়!"

প্রতাপ বলে, "ফোঃ! মগের মুল্লুক নাকি গো? সে গুড়ে বালি। এখন তোমায় ফেলে পালিয়ে যাবার মতলব। বিজ্ঞাপন একটা ভাওতা। চল আমার সঙ্গে,—এক হাত নিয়ে নি।"

প্রতাপ হোঁদলকে সঙ্গে করে যায়। তাদের দেখে সার্কাস-মালিকের চোখ ত চড়কগাছ! তিনি ভাবেন, কি কুক্ষণে যে কলকাতায় এসেছিলেন! এ দেশের দশদিকে নাকি পাজির পাঝাড়া গ্রহ-নক্ষত্র আর দিন-ক্ষণ ছড়িয়ে আছে। তাই পাঁজি দেখে পা বাড়াতে হয়। তা করেন নি বলে এ গেরো।...

প্রতাপ পকেট থেকে বিজ্ঞাপন বার করল। তা দেখিয়ে বলল, "বহুৎ ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা করে আপনার পেট (প্রিয়) হোঁডল কুটকুটকে জ্যান্ত পাকড়াও করেছি, মিষ্টার। যা রেগেছিল, হয়ত দাঁতে কেটে কুটিকুটি করত। বুঝে নিন। আর ফ্যাকড়া নয়, পুরস্কারের টাকাটাও চটপট মিটিয়ে দিন দিকিন।"

এড়াবার পথ খুঁজে সার্কাস-মালিক চোখে অন্ধকার দেখেন। ঢোক গিলে বলেন, "নো, নো, নট্ ডিস্। (উহুঁ এ নয়।) হোঁডল কুটকুট হনলুলুকা চিজ (জিনিস) হ্যায়,—মানুষ নেহি,—জানোয়ার। ছোটা আঁখ (চোখ), ফ্লাট (বোঁচা) নাক, বঢ়া (বড়) কান, বডনমে পশম (মুখে লোম)। উল্লুকা মাফিক (উল্লুকের মত) ল্যাজ,—আউর নাচ দেখাটা অ্যায়সা (এরকম)।"

প্রাণের দায়ে সার্কাস-মালিক নেচে দেখান।

কিন্তু এড়াতে পারেন না। প্রতাপ বলে, "আমি সার্কাসে একে নিজ চোখে দেখেছি। ঠিক মনে আছে।" হোঁদলকে সাক্ষী মানে, "বল না গো, তুমি হোঁডল কুটকুট কিনা।"

হোঁদল দাঁত দেখিয়ে বলে, "হুঁহুঁ, উ হাম্ হ্যায়।"

প্রতাপ জোর দিয়ে বলে, "মিষ্টার জাঁদরেল সব সাক্ষী আছে। আমার পাশে বসে শো (খেলা) দেখেছেন হাইকোর্টের জজ মিষ্টার হ্যাট্রিক, ব্যারিষ্টার মিষ্টার বর্ম্মন, এডভোকেট মিষ্টার আচার্য্য এবং আরও অনেকে। আমরা খেলার সময় স্ন্যাপ (ছবি)ও নিয়েছি। তাতে প্রমাণ হবে, মানুষকে জানোয়ার সাজিয়ে আপনি ঠকবাজি করেছেন। আবার বিজ্ঞাপন দিয়ে কথার খেলাপ। এ দু'ধারার অপরাধের সাজা জানেন?"

আইনের ধারার ধারে-কাছে তিনি কখনো যান না। বেজায় ঘাবড়ে গেলেন। এখানে এসে আম অনেক খেয়েছেন; কিন্তু তাঁর মুখ আমসি হয়ে গেল।

লোকটা এডভোকেট জেনে তিনি ক'ঢোক জল খেলেন।

তারপর বললেন, "ইষ্টাহারকা খুঁতি জরুর ডেঙ্গে (বিজ্ঞাপনের খুঁতি নিশ্চয় দেব)।"

অনেক দর কষে তিন হাজারে আপস রফা হ'ল। তখন সার্কাস-মালিক তিন হাজার টাকার এক খুঁতি দিয়ে বললেন, "লিজিয়ে।"

সীলমোহর-আঁটা খুঁতি। প্রতাপ তা খোলার উপক্রম করতে তিনি খুঁৎখুঁৎ করে জানালেন, "ঝঞ্ঝাট মাট্ কর্ না। গুণকে রাখ্খা। (মিছে খোলার হাঙ্গামা। গুণে রেখেছি।)"

কিন্তু প্রতাপ খুলে দেখে, ঠন্ঠন্। এক টাকাও সেখানে নেই। প্রতাপ শাসিয়ে বলে, "তিন নম্বর ঠকবাজি?"

প্রতাপের কথা গায়ে না মেখে সার্কাস-মালিক বলেন, "সরি, ভেরি সরি। ক্লার্ক আড্মীকা কসুর হ্যায়। বহুট্ সাজা ডে ডেঙ্গে উন লোগকো। (খুব দুঃখিত। কেরাণীদের গলতি। ওদের খুব শাস্তি দেব।)"

তিনি এবার কড়কড়ে নোট এনে বললেন, "লিজিয়ে। (নিন)।"

প্রতাপ হাত বাড়িয়ে নেয়, আর সার্কাস-মালিক গোমড়া মুখে হোঁদলের পিঠ চাপড়ান। বলেন, "খাচ্চাকা অণ্ডরমে ঘুস্ যাও, বাচ্চা। (বাছা, খাঁচার ভেতর চলে যাও।)"

হোঁদল আর খাঁচায় যায় না, সার্কাস-মালিকও কিছু বলেন না। সে ভাগুক কিংবা ভাগলপুরে যাক তাঁর এসে যায় না। আবার বাগে না ফেললেই হয়।

প্রতাপ হোঁদল সহ উঠে দাঁড়াতে তিনি তোয়াজ করে

বললেন, "মিষ্টার, এ কাপ অব টি অ্যাণ্ড কেক্ প্লিজ। (মশাই, এক কাপ টি আর কেক—)"

"থ্যাঙ্কস্" বলে ওরা বেরোয়। সঙ্গে মোটর ছিল। একরাশ ধোঁয়া সার্কাস-মালিকের দিকে ছুড়ে মোটর চলে যায়।

আঠার

পরদিন সার্কাস পার্টির কালো বর্ডার দেওয়া ইংরেজী ও বাংলা বিজ্ঞাপন সহরময় বেরোয়। মৃত্যুসংবাদ, তাই কালো শোকচিহ্ন।

শোক-সংবাদ

আপনাদের অতি প্রিয় 'হোঁডল কুটকুট' উধাও হবার পর এক ভদ্রলোক তাকে উদ্ধার করে দিয়ে যান। পুরস্কারের টাকা তাঁকে দেওয়া হয়। হোঁডল কুটকুটকে তার খাঁচায় রাখা হয়। খাঁচা-রক্ষক খাবার দিতে গিয়ে তার আর বাঘিনীর খাঁচার মাঝের পার্টিশন আল্‌গা ভাবে আটকায়। খেয়াল করে না। কিন্তু হোঁডল কুটকুটের ওপর বাঘিনীর ছিল বেজায় রাগ। এ সুযোগে দোর খুলে পা টিপে ঢুকে সে তাকে বাগে আনল। বাঘিনী স্ত্রীলোক বলে বীরশ্রেষ্ঠ হোঁডল কুটকুট তার সঙ্গে লড়ল না। বিনাযুদ্ধে অকাতরে মরল, টু শব্দ অবধি করল না। বাঘিনীর গর্জ্জনে সবাই এসে দেখল, হোঁডলকে খেয়ে সে সাবাড় করেছে। হোঁডলের শরীরে হাড় নেই, ছিল মাংস, মেদ, চর্ব্বি আর রক্ত। নির্ল্লজ্জা বাঘিনী সব চেটে পুটে খাওয়ায় হোঁডলকে সসম্মানে

সৎকার করা সম্ভব হ'ল না। বাঘিনীর অপরাধের জন্য গুলি করা হয় নি, কারণ সবার প্রিয় হোঁডলমণির স্মৃতিচিহ্ন ধারণ করে সে গরবিনী হয়েছিল। এ দুর্ঘটনায় সবার মন টন্‌টন্‌ করে উঠেছে। তাই তাঁবু গুটিয়ে আমরা তীর্থ-পর্য্যটনে যাওয়া স্থির করেছি। ··· ···

পৃথিবীতে অনেক অঘটন ঘটে। কাজেই এ বিজ্ঞাপন রটনায় কেউ অবিশ্বাস করল না। সবাই আপশোষ করে বলল, "আহা অবশেষে অমন সেরা জানোয়ার বাঘে খেল।"

নানা আলোচনা হ'ল—"বেহুঁশিয়ার খাঁচা-রক্ষকের পিঠে কষে বেত লাগান দরকার।"

"আর বাঘটাও কি বে-আক্কেলে। খাবি ত গাধা, ঘোড়া, বানর কত কিছু ছিল। বেছে বেছে খেলি কিনা ঐ হোঁডল কুটকুটকে!"

"বাঘ অমন বেরসিকই হয়। রেগেমেগেই থাকে। রঙ্গ-রস বোঝে না। খোঁজে খালি রক্ত আর মাংস।"

"বাঘটাকে না মেরে ভালোই করেছে। ওটার পেটে একটা হোঁডল কুটকুট যদি জন্মায়।"

ছোট ছেলেরা ছড়া কাটে—

"সার্কাসের সেরা হোঁডল,
নৈলে সকল খেলা বিফল।
সেই হোঁডলে খেল বাঘে,
সবাই মরে দুঃখে রাগে!"

কিন্তু হোঁদল আর প্রতাপ দুঃখ আর রাগ প্রকাশ করে না। তারা হাসে।

সার্কাসওয়ালা তাঁবু তুলে ফেলে। তা দেখতে লোকের ভিড় জমে। মালিক শুকনো মুখে বলেন, "বহুট আপশোষ কি বাট। হোঁডল মর গিয়া। উস্‌ওয়াস্তে চলা যাটা। গুড নাইট। (বড় দুঃখের কথা, হোঁডল মরে গেছে। তাই চলে যাচ্ছি। শুভরাত্রি !)"

ছোট ছেলেরা বলে, "ভেরি সরি। অল্ রাইট্। (খুব দুঃখিত। আচ্ছা।)"

কিছুদিন পর প্রতাপ হোঁদলকে বলল, "ভাই, সার্কাস কি করে চালাতে হয় তা ত শিখেছ। ও ব্যবসাতে পয়সা আছে। আফিসে কলম-ঘসা ওছা চাকরিতে শেষকালে শ্বাসকষ্ট ও অসুখ সৃষ্টির চেয়ে ডন-কসরতের দল গড়া ভালো। তাতে স্বাস্থ্য, অর্থ, আর নাম তিনই মেলে, দেশ-বিদেশে জাতির সম্মান বাড়ে। অবশ্য নোংরা উপায় ধরতে নেই।"

হোঁদল বলল, "অনেক টাকার দরকার। মানুষ আর জানোয়ারের মস্ত বড় দল, আর তা নিয়ে দেশ-বিদেশ ঘুরে খেলা দেখানোর ধকল কম নয়। টিকিট কেটে যারা মজা দেখে তারা জানে না। যারা দেখায় তারা ঠেলা জানে।"

"কষ্ট করেই ত কেষ্ট পেতে হয়। আর কেষ্ট পেলে ইষ্টলাভ" প্রতাপ হেসে কয়। "দেখ শ্যামাকান্ত, রামমূর্ত্তি—এঁদের কথা লোকে এখনও মনে করে। আচ্ছা এক কাজ করলে হয়। বায়োস্কোপ এদিকে নতুন এসেছে। সার্কাস আর বায়োস্কোপ ঠিক এক ধাপের না হলেও রঙ-ঢঙ এক ছাপের। কাজের চাপের ফাঁকে ফাঁকে লোক আনন্দ চায়। বরং ছবিঘর চালনার ব্যবসা—"

"তা ত ঠিক জানি নে। হল্ জোটানো, ফিল্ম জোটানো।"

"সে ব্যবস্থা করা কঠিন হবে না। বাবার এক বড় মক্কেল ছবিঘরের মালিক। পাশ দেন, আয়েস করে বসে দেখি। তাঁকে বলে হল্ ও ফিল্ম ভাড়ার বন্দোবস্ত করা যাবে।"

তবু হোঁদল ভরসা পায় না, বলে, "তুমিই হাত দাও ভাই। আমার যা আছে তোমাকে দি। তুমি জাহাজের খবর রাখ, আর আমি ত আদার বেপারী।"

"আদার বেপারীরও একদিন জাহাজের খবর করার দরকার হতে পারে।"

প্রতাপ অনেক উৎসাহ দেয়, তার লেখাজোকা নেই। শুধু উৎসাহ দেওয়া নয়, সে উদ্যোগও করে। কাজেই হোঁদল রাজী হয়।

প্রতাপের বাবার ঢের ব্যবসায়ী মক্কেল ছিল। প্রতাপ তাদের কাজে লাগায়। তাদের সাহায্যে হল্‌ঘর ভাড়া নেয়, ফিল্ম ধারে আনে। নিজে ইংরেজী ও বাংলা বিজ্ঞাপন লেখে। তা রংচঙে কালিতে ছেপে নানা জায়গায় সেঁটে দেয়। হলের বাইরে চমকান রংবেরঙের আলোর বাহার জ্বলে। ভালো কন্‌সার্ট ও গানের ব্যবস্থা করে। আর দর্শকদের জন্য ভালো ব্যবহার, আর ছবি। অর্থাৎ সবই সভ্য ভব্য, খাঁটি দুধে তৈরী গব্য জিনিসের মত।

তখনকার দিনে ছবিতে কথা কইত না, নির্ব্বাক ছবির যুগ। কিন্তু আনন্দ ও প্রশংসায় গদ্‌গদ দর্শকদের গাদাগাদিতে হল্‌ঘর সবাক হয়।

ছেলেবেলাকার হদ্দকুড়ে সেই ভোঁতা হোঁদল আজ কুড়েমী

ছেড়ে, ঘুরে ঘুরে তাদের তালাপি করে। ঠেকে শিখে সে চতুর, চটপটে ও ধারাল হয়েছিল।

সে টিকিট-ঘরে বসে বিক্রীর তদারক করে। টাকাপয়সার হিসাব নিজে রাখে, ভুলচুক করে না। বোঝে, মস্তবড় দুধের কড়া থেকে ছোট্ট ক'টা বেড়াল চুক্‌চুক্ করে যখন-তখন দুধ খেলে, একফোঁটা দুধও থাকে না। লাঠি নিয়ে সারাদিন বেড়াল তাড়ানোর ঝামেলা কম নয়। তাতে সময়ও নষ্ট, মেহনতও আছে। তার চেয়ে, দুধ পোক্ত মিট্‌শেফে রাখলে কোনও কষ্ট নেই। বেড়ালকে মার দিতে হয় না, আর মার না খেয়ে তারা অভিসম্পাত করে না। দূর থেকে মিউ মিউ করে বেহালা শোনায়। একফোঁটা দুধ ভিক্ষা পেলে, লেজ নেড়ে লোটাভরা আশীর্ব্বাদ জানায়। ব্যবসায়ে এ দৃষ্টান্তের দাম কম নয়।

এই তুখোর ধারা ধরে হোঁদলের ব্যবসা দাঁড়িয়ে যায়। হোঁদল প্রতাপকে তার ব্যবসায়ে টানতে চায়। প্রতাপ তার সততায় খুসী হয়; কিন্তু এড়িয়ে বলে, "আমি ভাই ওকালতির নৌকায় চলেছি। ব্যবসায়ের নৌকায় পা বাড়ালে দু'নৌকা সামলাতে পারব না। দু'নৌকা দু'দিকে টানবে, দু'পা দু'দিকে টেনে ছিঁড়ে দেবে। বরং যে যার নৌকা পাশাপাশি চালিয়ে, মাঝে মাঝে একসঙ্গে ভিড়ে গুড়গুড়ি টানব।"

আসলে ওরা কেউ গুড়গুড়ি ধরে নি। নিছক রহস্য।

হোঁদল বলে, "কি আর করা। উকিল মানুষ, উঁচু হিলের নতুন জুতোর মত জৌলুস।"

উনিশ

হোঁদলের বায়োস্কোপ জেঁকে উঠল। সে পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান হয়েছিল, এ তারই প্রতিদান। স্পোর্টে ভালো দৌড়াবার পুরস্কার!

ক্রমে ক্রমে ভালো জায়গা খুঁজে নিয়ে সে নিজের হল্‌ঘর তৈরী করাল। দর্শকদের বসার, বিশ্রামের ও রেস্তোঁরার সুবন্দোবস্ত।

সময় করে প্রতাপ আসে, এক আধটু পরামর্শ দেয়। হোঁদল খুসীমনে তা মেনে নেয়।

অবস্থা ভালো হবার পর সে প্রতাপের উদ্যোগে ভালো ঘরে বিয়ে করে। বাড়ী ভাড়া করে।

ইতিমধ্যে প্রতাপও বিয়ে করেছিল। বন্ধুদের মত বন্ধু-পত্নীদেরও ভাব হয়। অবসর সময়ে তারা একসঙ্গে এখানে সেখানে বেড়ায়; যাদুঘর, চিড়িয়াখানা ও নানা স্থান দেখে।

মেট্রো গোল্ডউইন্‌ বা কোন বড় কোম্পানীর একটা চমক-লাগা ফিল্ম এসেছিল। চেষ্টা ফিকির করে প্রতাপ তা হোঁদলের হলে আনাল। ক'দিন পর হোঁদলকে বলল, "নামকরা ছবি। মেয়েরা দেখতে চায়। আজ ছুটির দিন। এসো একসঙ্গে দেখি।"

ময়রাদের যেমন মিষ্টি খাবার লোভ নেই, বায়োস্কোপের ব্যবসা করে হোঁদলেরও তেম্নি। সে অপরকে দেখিয়ে পয়সা কামায়, বিনা টিকিটে দেখে নিজের আয় কমাতে চায় না।

কিন্তু প্রতাপের অনুরোধ এড়ান যায় না। দু'বন্ধু সস্ত্রীক দেখতে যায়।

স্পেশাল বক্সে পাশাপাশি বসে তারা দেখে। রেস্তোঁরা থেকে চা-খাবার আনিয়ে খায়, গল্প করে। ইংরেজী ফিল্ম। মেয়েরা ঠিক বোঝে না। তবু আফ্রিকার জঙ্গলের বুনো পশুর নানা ধরণ-ধারণ দেখে আনন্দে আটখানা হয়।

ট্রেডার হর্ন ও কিংকং জাতীয় ছবি। বুনো পশু ধরে কি করে বশ করা হয়, সার্কাস পার্টির কাজে লাগান হয় তা দেখিয়ে, অবশেষে দেখায় চমৎকার সার্কাস খেলার ছবি। ফিল্মের সঙ্গে সার্কাস জুড়ে দেওয়ায় চমৎকার লাগে। সিংহ, বাঘ, হাতী, গরীলা, শিম্পাঞ্জীর তামাশা। কিন্তু হঠাৎ তার মাঝে 'হার্ডেল কিট'এর কৌতুককর শো। ভেংচি কেটে ছোট্ট লেজ নেড়ে মুখে ডুগডুগি বাজিয়ে সে ঢং করে দাঁড়িয়ে বলে, "গুড মর্ণিং!" আর দু'বন্ধুর স্ত্রী হেসে কুটিকুটি হয়।

হোঁদল ও প্রতাপ অবাক হয়ে দেখে 'হার্ডেল কিট' নাম দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু আসলে তা 'হোঁডল কুটকুট' অর্থাৎ হোঁদল স্বয়ং! তাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে, বিদেশে খেলা দেখাবার সময় সার্কাস-মালিক এই কারসাজি করেছে। কোনও ফিল্ম প্রস্তুতকারকের যোগাযোগে সেই ছবি তুলে, তা বেচে পয়সা কামিয়েছে। আর ফিল্ম কোম্পানী আফ্রিকার জংলী পশুর সঙ্গে তা জুড়ে, এই চটকদার ছবি করেছে নিখুঁত করে। নামকরণেও খুঁৎ রাখে নি। 'হার্ডেল কিট' নামে ছবিটি বিদেশে হিট করেছে। কিন্তু এদেশে এসে হোঁদলকে চিৎ করে দিল। শুধু চিৎ নয়, চিৎপটাং।

সার্কাস-মালিক হোঁদলকে মুনাফার ভাগ দেয় নি। এজন্য তার রাগ ও দুঃখ নেই। কিন্তু সে যেন পেছনে বাঘাকুকুর লেলিয়ে দিয়েছে! হোঁদল ভিক্ষা চায় না, কুকুর সামলালেই রক্ষা।

দুই বন্ধুপত্নী বোঝে না। 'হার্ডেল কিট' জানোয়ার কিনা—যার যার স্বামীর কাছে জানতে চায়। হোঁদল প্রতাপের দিকে চেয়ে চোখ টিপে; বলে, "জানি নে।"



প্রতাপ বলে, "আফ্রিকার বা কোনও জায়গার জানোয়ার। হার্ডেল মানে বাঁধা, আর কিট মানে সাজসজ্জা, অর্থাৎ বাঁধার সজ্জা। ইংরেজী শব্দ ত,—বাংলা করে বোঝান শক্ত।"

ওরা ইংরেজী বোঝে না, তাই তার অর্থ খোঁজে না, চুপ করে থাকে।

প্রতাপের স্ত্রী স্বামীকে প্রশ্ন করে, "কোথায় থাকে?"

প্রতাপ রহস্য করে বলে, "বক্সে।"

হোঁদল কুৎকুৎ

হোঁদলের স্ত্রী স্বামীকে বলে, "আমরা ত বক্সে বসেছি। ও এখানে কি করে বসবে?"

বেকায়দার প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে হোঁদল মাথা চুলকায়। তখন তার হয়ে প্রতাপ বলে, "তোমাদের বক্সে বসতে দেখে ভয়ে সিন্দুক বেছে নিয়েছে।"

প্রতাপের স্ত্রী জিজ্ঞেস করে, "অত বড় জানোয়ারের অত ছোট লেজ কেন?"

প্রতাপ বলে, "হরদম লেজ বইতে দম্ আটকায়। তাই ছোট করে কেটে বক্সে রেখে দিয়েছে।"

হোঁদলের স্ত্রী ভয় পেয়ে এদিক-ওদিক তাকায়। বলে, "ছাট মারবে না ত?"

হোঁদলের দিকে চেয়ে প্রতাপ মুখ টিপে বলে, "কি গো, তুমি ত জোয়ান লোক। পাখসাট মেরে আটকাতে পারবে না?"

এবার ঠাট্টা টের পেয়ে তাদের স্ত্রীরা মুখ টিপে টিপে হাসে। কিন্তু হোঁদলের কাঁদতে বাকি থাকে।...

কুড়ি

জোর টিকেট বিক্রী হচ্ছিল। হার্ডেল কিটের জোরদার রগড় দেখার জন্য সহর ভেঙ্গে লোক আসে—ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ, বাচ্চা-কাচ্চা। তারা চোখ বড় করে দেখে বলাবলি করে, আচ্ছা তামাশা ত! বাপের বয়সে এমন রগড় তারা দেখে নি। এ যেন বরাবর মন ভরে রাখার মত!

কিন্তু হোঁদল হঠাৎ শো দেখান বন্ধ করে দেয়। লোকেরা

দেখার জন্য সোরগোল-তোলে। হোঁদল জানায় আগুন লেগে ফিল্ম ছাই হয়ে গেছে। প্রতাপ তা টের পায়। অবাক হয়ে হোঁদলকে বলে, "কি গো শো বন্ধ করলে কেন? অন্ধ হলে নাকি? যা টিকেট বিক্রী হচ্ছিল, টাকা কামিয়ে লাল হয়ে যেতে।"

হোঁদল বলে, "আকাশ কালো করেছে ভাই। তাই ব্যবসার হাল ঘুরিয়ে দিলেম। সামাল দেওয়া চাই ত। গিন্নী বায়না ধরেছে, আশ মিটিয়ে 'হার্ডেল কিট' দেখবে! তারপর খুঁটে খুঁটে দেখে, হঠাৎ যদি কপাট খুলে জাপটে ধরে বলে, 'লেজে আটকান চলবে না। হাঁউ মাঁউ খাঁউ—মানুষের গন্ধ পাউ,—তোমায় আমি টের পেয়েছি!'···তখন নাক কাটা যাবে। একেবারে চূণকালি মেখে কালো হয়ে যাব! ধন বড় না মান বড়?"

প্রতাপ বলে, "ধন পেয়ে এখন মানের ওজন করছ! কিন্তু ধন কেমন করে ঝনৃঝনিয়ে এল তা শুনি?"

হোঁদল বুদ্ধিমানের মত বলল, "সে কথাই ত আজ গিন্নীকে জানান চলে না! হোঁদলরাম নাম জানে, তা মন্দ কথা নয়। তাতে রামনাম আছে। ভগবানের সে নামে সব রকমের ভূত ভয় পায়। কিন্তু তা ছেটে কুৎকুৎ জুড়ে দিলে, তা জুৎ পেয়ে উল্টে ভয় দেখাবে। তাতে তার ফিট না হোক, আমার চিৎ হওয়া আটকাব কি করে বল?"

প্রতাপ হেসে বলে, "তাতে মান বাঁচবে ভেবেছ? আমি ত জানি তুমিই হোঁদল কুৎকুৎ, হোঁডল কুটকুট, আর হার্ডেল কিট!"

প্রতাপ তাকে কতখানি জানে, মনেপ্রাণে ভালোবাসে,

হোঁদলের তা অজানা নয়। সে তার পানে নরম চোখে চেয়ে বলে, "তুমি চিরদিন তা বলেই জেন ভাই। তাতে আমার মানহানির কিছু নেই। কিন্তু—"

"তোমার গিন্নী না জানে এই ত? এ কথা তাকে কেন, আমার গিন্নীকেও জানাব না। তাতে আমারও মান বাঁচবে। আমরা বন্ধু যে! এক পীরের দরগায় চিরদিন সিন্নি দেব।"

তার এটুকু আশ্বাসে অনেক বিশ্বাস। হোঁদল প্রতাপের কানের কাছে মুখ এনে গদ্‌গদ হয়ে বলে, "তা জানি ভাই।"

হঠাৎ তার কানের পুরাণো জখম তার নজরে পড়ে। স্কুলে ছেলেবেলাকার ঝগড়ায় একদিন সে আঁচড়ে তা করেছিল। প্রতাপ রেগেমেগে বলেছিল, এর শোধ নেবে। কিন্তু নিতে পারে নি। আলাদা পথে চলে দু'জনেই ভুলে গিয়েছিল। হোঁদলের তা মনে পড়ল। প্রতাপেরও পড়ল কিনা কে জানে? সে কিন্তু শোধ নিল,—অজানতে, অন্য ভাবে! অত্যন্ত স্নেহে দু'হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরল।

হোঁদল চোখ বুজল। ছলছল চোখে টলমল গলায় বলল, "সবার কাছে আমাকে যতই তুলে ধর ভাই, তোমার কাছে আমি কিন্তু সেই—হোঁদল কুৎকুৎ!"

সম্পূর্ণ

লেখকের বিভিন্ন বই সম্বন্ধে অভিমত

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসুর 'হোঁদল কুৎকুৎ' শিশুসাহিত্যে একটি উৎকৃষ্ট রচনা।...

শ্রীযুক্ত বসু শিশুসাহিত্যে একজন সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক। যাঁহারাই শিশুসাহিত্যে আগ্রহশীল, তাঁহারাই তাঁহার রচনার সঙ্গে পরিচিত ও উহার অকুণ্ঠ প্রশংসায় মুখর।...

আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশা করি যে, তিনি তাঁহার পরিণত প্রজ্ঞা ও শিল্প-কৌশলের সাহায্যে এই পরিবর্ত্তনশীল যুগের উপযোগী শিশুসাহিত্য সৃষ্টি করিয়া যাইবেন, ও কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার তাঁহার লেখার উপযুক্ত সমাদর করিয়া প্রকৃত গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিবেন।

শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ., পি-এইচ্. ডি.
(অবসরপ্রাপ্ত রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসুর লেখা 'হোঁদল কুৎকুৎ' পড়িয়া প্রীত হইলাম। সহজবোধ্য ভাষায় লেখা এমন কৌতুককর কাহিনী শুধু কিশোর নয়, বড়দেরও তৃপ্তি দেয়। শুধু কৌতুক নয়, বইটিতে শিক্ষার উপাদানও প্রচুর আছে। সবকিছু মিলিয়া বইটি শিশুসাহিত্যে এক অনুপম সৃষ্টি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রফুল্লবাবু তাঁর অন্যান্য পুস্তকেও শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়া শিশুসাহিত্যে এক বিশিষ্টস্থান অধিকার করিয়াছেন। বৃদ্ধবয়সে নানা বিপর্য্যয়ের মধ্যেও তিনি একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবা লইয়া আছেন,—এজন্য অভিনন্দন যোগ্য।

শ্রীনির্ম্মলকুমার সেন, এম. এ., ডি. এস্-সি,
এফ. আর. আই. সি., এফ. আই. সি., এফ. এন্. আই.
(কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়ন বিভাগের
প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক)

…'হোঁদল কুৎকুৎ' বইখানির রচনা সরস,– আগাগোড়া কৌতুকরসে ভরপূর,—চিত্রগুলি অপূর্ব্ব। আমি এই বইখানির দিকে শিশুসাহিত্য-রসিক ও শিশুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

শ্রীকালিদাস রায় (কবিশেখর)

I have read with pleasure 'Hondol Kutkut', a book of story for childran and am sure that the work will be welcome by them not only for the pictures, but also for the educative entertainment it provides in an easy and attractive style.

Manmatha Nath Roy,
Production Officer, Homo (Publicity) Department, Govt. of West Bengal.

I have read with pleasure 'Hodal Kutkut' by Sri Prafulla Chandra Bose. Written in an elegant and educative style it has earned immense popularity amongst juvenile readers

His other books—'Talpatar Sepai', 'Manik Jor' and 'Hasanta Maharaj' are equally attractive.

In spite of his old age and broken health he is a devoted litterateur and is making valuable contributions specially to children literature, for which he deserves appreciation and encouragement.

J. C. Ghosh,
(*Secretary, Public Service Commission, West Bengal*).

লেখকের 'কাবলী বেড়াল' পড়িলাম। এমন কৌতুককর কাহিনী কেবলমাত্র শিশুদিগের নহে—প্রবীণ ব্যক্তিরও উপভোগ্য। সাধারণ বিষয়কে অসাধারণ করিয়া তুলিবার ক্ষমতা বর্ত্তমান লেখকের আছে,—সে পরিচয় তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বিভিন্ন রচনার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

'কাবলী বেড়াল' তাঁহার পরিণত বয়সের রচনা, সুতরাং ইহার মধ্যে তাঁহার পূর্ণতর শক্তির বিকাশ হইয়াছে। আমাদের দেশে শিশুপাঠ্য গ্রন্থের চাহিদা যে পরিমাণে বাড়িতেছে, সেই পরিমাণে উপযুক্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে এমন কথা বলিতে পারা যায় না। যথার্থ অভিজ্ঞ ও শক্তিশালী লেখকের অভাবই ইহার কারণ।

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসু মহাশয়ের অভিজ্ঞতা ও শক্তি দুইই আছে, সেই জন্য তাঁহার রচনা মাত্রই আকর্ষণীয়। 'কাবলী বেড়ালে'ও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। ইহা পাঠ করিয়া সকলেই আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করি।

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য, এম. এ, পি-এইচ্. ডি.
(অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ)

লেখকের 'দিগ্বিদিক' সম্বন্ধে 'দেশ' পত্রিকা বলেন—

ছোটবেলায় যাঁর লেখা অনবদ্য হাসির বই 'হোঁদল কুৎকুৎ' বা 'তালপাতার সেপাই' আমাদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছে, সেই প্রফুল্লবাবুর বর্তমান সমাজ-জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন টেকনিকে লেখা ব্যঙ্গোপন্যাস 'দিগ্বিদিক' সেই একই রসের আস্বাদ নতুন করে এনেছে। যুদ্ধোত্তর যুগের নীরোপন্থীদের যারা 'ট্যামগোপালের নাতি', 'বাক্যবাগীশ' ও 'আপনি মোড়ল' সেজে 'গোবর-গণেশ'দের মুখে লাগাম কষে রেস খেলে তাদেরই আকার-প্রকার ও পরিণতি ব্যঙ্গরেখায় অঙ্কিত করেছেন তিনি এই গ্রন্থখানিতে। ব্যঙ্গের রেখা অজস্র ছড়িয়ে আছে পাতায় পাতায়। বইখানি পাঠকমাত্রকে তৃপ্তি দেবে।..